মাসিক
আল-আবরার
The Monthly AL-ABRAR

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৪, সংখ্যা-০৮

সেপ্টেম্বর ২০১৫ ইং, জিলহজ ১৪৩৬ হি., ভাদ্র ১৪২২ বাং

ذوالحجة ١٤٣٦ه ستمبر ٢٠١٥م

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)

প্রধান সম্পাদক

মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

মুহাম্মদ হাশেম

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী

সার্কুলেশন বিষয়ে যোগাযোগ
০১১৯১৯১১২২৪

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র
প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :.............................. ৩
পবিত্র সুন্নাহ থেকে :
‘ফাজায়েলে আমাল’ নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৯ ..... ৫
দরসে ফিকহ :
কোরবানী : ফাজায়েল ও মাসায়েল............... ১০
মুফতী শাহেদ রহমানী
হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ১৬
মাওয়ায়েযে ফকীহুল মিল্লাত :
আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত ইখলাস................. ১৭
“সিরাতে মুস্তাকীম” বা সরলপথ :
গায়রে মুকাল্লিদদের ইমাম
মরহুম আলবানী সাহেবের প্রকৃত পরিচয়............. ১৯
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক
নতুন শিক্ষাবর্ষের সূচনা : কিছু কথা কিছু নিবেদন.......... ২৩
মাওলানা মুফতী জমীল আহমদ
বন্য প্রাণীর কোরবানী ২৬
মুফতী শরীফুল আজম
মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-২০....... ৩১
মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ১৬...... ৩৭
মাও. ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪২
মলফূজাতে আকাবের ৪৭
আবু নাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪০২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.com
www.monthlyalabrar.wordpress.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক: ০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১১৯১৯১১২২৪

সম্পাদকীয়

ফজীলতপূর্ণ জিলহজ মাস : আমাদের করণীয়

জিলহজ মাস হিজরী বর্ষের শেষ কড়ি। এই মাস শেষ হতেই একটি হিজরী বর্ষ পূর্ণ হয় তথা মানুষের আয়ু থেকে একটি হিজরী বর্ষ বিয়োগ হয়। মহান দয়ালু ও অনন্ত অসীম করুণার মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হিজরী বর্ষের শেষ মাসটিতে এমন এমন ফজীলতপূর্ণ আমল ও সময় উপহার দিয়েছেন, যা পালন ও মূল্যায়ন করে মুসলমানগণ গোনাহমুক্ত হয়ে এবং অগণিত ফজীলত অর্জন করে বর্ষটির শুভসমাপ্তি ঘটাতে পারে। সাথে সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে নতুন বর্ষে পদার্পণ করতে পারে।

একজন মুসলমান পুরো বছর যত প্রকারের ইবাদত করে থাকে সব ধরনের ইবাদত এই মাসে একত্রিত করা হয়েছে। যেমন নামায, রোযা, সদকা, যিকির-আযকার ইত্যাদি। এর বাইরে এই মাসের ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ইবাদত রয়েছে হজ এবং ওয়াজিব কোরবানী। যা অন্য কোনো মাসে করা যায় না। উলামায়ে কেরাম বলেছেন, হতে পারে এই মাস সবচেয়ে বেশি ফজীলতপূর্ণ হওয়ার অর্থ এটিই। জিলহজ মাসের প্রথম ১০ দিনের ফজীলত সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ، يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ القَدْرِ

আমলের জন্য আল্লাহর কাছে জিলহজের প্রথম ১০ দিনের চেয়ে প্রিয় আর কোনো দিন নেই। এর এক দিনের রোযা এক বছরের রোযার সমান এবং প্রতি রাতের ইবাদত শবেকদরের ইবাদতের সমান। (তিরমিযী হা. ৭৫৮, ইবনে মাজাহ হা. ১৭২৮)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আশরায়ে জিলহজের নেক আমলের চেয়ে আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় অন্য কোনো দিনের কোনো আমল নেই।' সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, 'জিহাদও কি এই ১০ দিনের আমলের চেয়ে উত্তম নয়?' নবীজি (সা.) বললেন, জিহাদও উত্তম নয়। তবে হ্যাঁ, সেই ব্যক্তির জিহাদ এই ১০ দিনের আমলের চেয়ে উত্তম হতে পারে, যে স্বীয় জানমাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হলো। অতঃপর জিহাদের ময়দানে জানমাল সব কিছু বিসর্জন করে দিয়ে কিছু নিয়েই ঘরে ফিরে এল না। (বুখারী, হা. ৯৬৯, আবু দাউদ, হা. ২৪৩৮, তিরমিযী, হা. ৭৫৮)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহর নিকট কোন দিন প্রিয় নয়, আর না তাতে আমল করা, এ ১০ দিনের তুলনায়। সুতরাং তাতে তোমরা বেশি করে তাহলীল, তাকবীর ও তাহমীদ পাঠ করো। (তাবারানী ফীল মুজামিল কাবীর)

এ মাসের স্বতন্ত্র আমলের মধ্যে আছে হজ, যা ইসলামের রুকনসমূহের অন্যতম। হজ সম্পর্কে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হজ আদায় করে এবং সেখানে যাবতীয় মন্দ কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকে, সে সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানের মতো গোনাহমুক্ত হয়ে ফিরবে। (বুখারী ১৪২৪)

এ মাসের আরেকটি ইবাদত কোরবানী। কোরবানী সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি প্রশান্তচিত্তে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কোরবানী করল, ওই কোরবানী তার জন্য জাহান্নাম থেকে প্রতিবন্ধক হবে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৪/১৭)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো ইরশাদ করেন, কোরবানীর দিনসমূহে আল্লাহ তা'আলার নিকট কোরবানী করার চেয়ে অধিক প্রিয় কোনো আমল নেই। কোরবানীর পশু কিয়ামতের দিন তার শিং, লোম, খুরসহ আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হবে। আর কোরবানীর পশু জবাইয়ের পর রক্ত জমিনে গড়ানোর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুল হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা এতে আনন্দিত হও। (তিরমিযী, হা. ১৪৯৩)

এরূপ অসংখ্য হাদীস এবং পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের কল্যাণে এই মাসের অসীম ফজীলত রেখেছেন। আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে, বছর শেষ হলে পুরো বছর ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলির একটি ফিরিস্তি তৈরি করা হয়। বিষয়টি আমাদের সামাজিক একটি রীতি হলেও ইসলামের দাবি হলো, প্রতিদিন মুসলমানগণ নিজের কৃত গোনাহ ও পাপগুলো স্মরণ করে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা ও তাওবা করা। এভাবে আমাদের দিন-মাস অতিবাহিত হলো। বছরের এই শেষ মাসে এসে যদি আমরা পুরো বছরের গোনাহগুলো স্মরণ করে এই ফজীলতপূর্ণ দিনগুলোতে কায়মনোবাক্যে তাওবা করি এবং যথাসাধ্য ফজীলতের কাজগুলো উত্তম রূপে আদায় করতে পারি নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত ফজীলত অর্জনে সক্ষম হব এবং জীবনকে গোনাহমুক্ত করে নতুন বর্ষে পদার্পণ করতে পারব। ওয়ামা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।

আরশাদ রহমানী
২৫/০৮/২০১৫ ইং

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (٤٢) فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٤٣) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (٤٤) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٥)

(৪২) আর আমি আপনার পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতিও পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর আমি তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা পাকড়াও কারেছিলাম, যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে। (৪৩) অতঃপর তাদের কাছে যখন আমার আযাব এল, তখন কেন কাকুতি-মিনতি করল না? বস্তুত তাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাছে সুশোভিত করে দেখাল, যে কাজ তারা করছিল। (৪৪) অতঃপর তারা যখন ওই উপদেশ ভুলে গেল, যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের সামনে সব কিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। এমনকি যখন তাদেরকে প্রদত্ত বিষয়াদির জন্য তারা খুব গর্বিত হয়ে পড়ল, তখন আমি অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তখন তারা নিরাশ হয়ে গেল। (৪৫) অতঃপর জালিমদের মূল শিকড় কর্তিত হলো। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা। (সূরা আনআম)

মানুষের জীবন-জ্ঞান তথা সব কিছুই সীমাবদ্ধ। তারা সীমাবদ্ধ জীবনের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে সমগ্র বিশ্বকে বোঝার চেষ্টা করে, তারা এ-জাতীয় বিষয়বস্তুতে বাহানাবাজির আশ্রয় নেয়। তারা পয়গম্বরদের ভয়ভীতি প্রদর্শন ও সতর্কবাণীকে কুসংস্কারপূর্ণ ধারণা আখ্যা দিয়ে গা বাঁচিয়ে যায়। বিশেষ করে যখন প্রায় সব যুগেই এমন অবস্থাও সামনে আসে যে, অনেক মানুষ আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতা সত্ত্বেও ধনেজনে সমৃদ্ধ হচ্ছে। অর্থ-সম্পদ, জাঁকজমক ও সম্মান মর্যাদা–সব কিছুই তাদের করায়ত্ত রয়েছে। একদিকে এ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা এবং অন্যদিকে পয়গম্বরগণের ভীতি প্রদর্শন যখন তারা উভয়টিকে মিলিয়ে দেখে, তখন বাহানাবাজ মন ও শয়তান তাদেরকে এ শিক্ষাই দেয় যে পয়গম্বরগণের উক্তি একটি প্রতারণা ও কুসংস্কারপ্রসূত ধারণা বৈ নয়। এর উত্তরে আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী উম্মতদের ঘটনাবলি এবং তাদের ওপর প্রয়োগকৃত আইন বর্ণনা করেছেন। বলেছেন–

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ

অর্থাৎ আমি আপনার পূর্বেও অন্যান্য উম্মতের কাছে স্বীয় রাসূল প্রেরণ করেছি। দুই ভাবে তাদের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। প্রথমে কিছু অভাব-অনটন ও কষ্টে ফেলে দেখা হয়েছে যে, কষ্টে ও বিপদে অস্থির হয়েও তারা আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে কি না। তারা যখন এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলো এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসা ও অবাধ্যতা ত্যাগ করার পরিবর্তে তাতে আরো বেশি লিপ্ত হয়ে পড়ল, তখন তাদের দ্বিতীয় পরীক্ষা নেওয়া হলো। অর্থাৎ তাদের জন্য পার্থিব ভোগ-বিলাসের সব দ্বার খুলে দেওয়া হলো এবং পার্থিব জীবন সম্পর্কিত সব কিছুই তাদেরকে দান করা হলো। আশা ছিল যে তারা এসব নিয়ামত দেখে নিয়ামতদাতাকে চিনবে এবং এভাবে তারা আল্লাহকে স্মরণ করবে। কিন্তু এ পরীক্ষায়ও তারা অকৃতকার্য হলো। নিয়ামতদাতাকে চেনা ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে তারা ভোগ-বিলাসের মোহে এমন মত্ত হয়ে পড়ল যে, আল্লাহ ও রাসূলের বাণী এবং শিক্ষা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গেল। উভয় পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর যখন তাদের ওজর-আপত্তির আর কোনো ছিদ্র অবশিষ্ট রইল না, তখন আল্লাহ তা'আলা অকস্মাৎ তাদেরকে আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করলেন এবং এমনভাবে নাস্তানাবুদ করে দিলেন যে বংশে বাতি জ্বালানোরও কেউ অবশিষ্ট রইল না। পূর্ববর্তী উম্মতদের ওপর এ আযাব জলে-স্থলে ও অন্তরীক্ষে বিভিন্ন পন্থায় এসেছে এবং গোটা জাতিকে মিসমার করে দিয়েছে। নূহ (আ.)-এর গোটা জাতিকে এমন প্লাবণ ঘিরে ধরে, যা থেকে তারা পর্বতের শৃঙ্গেও নিরাপদ থাকতে পারেনি। 'আদ' জাতির ওপর দিয়ে উপর্যুপরি আট দিন প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে যায়। ফলে তাদের একটি প্রাণীও বেঁচে থাকতে পারেনি। সামুদ জাতিকে একটি হৃদয়বিদারী আওয়াজের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। লুত (আ.)-এর কওমমের সম্পূর্ণ বস্তি উল্টিয়ে দেওয়া হয়, যা আজ পর্যন্ত জর্দান এলাকায় একটি অভুতপূর্ব জলাশয়ের আকারে বিদ্যমান। এ জলাশয়ে ব্যাঙ, মাছ ইত্যাদি জীবজন্তুও জীবিত থাকতে পারে না। মানুষ ডোবে না। এ কারণেই একে 'বাহরে-মাইয়্যেৎ' তথা 'মৃত সাগর' নামে এবং 'বাহ্‌রে-লুত' নামেও অভিহিত করা হয়।

মোটকথা, পূর্ববর্তী উম্মতদের অবাধ্যতার শাস্তি প্রায়ই বিভিন্ন প্রকার আযাবের আকারে অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে সমগ্র জাতি বরবাদ হয়ে গেছে। কোনো সময় তারা বাহ্যত স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে এবং পরবর্তীতে তাদের নাম উচ্চারণকারীও

কেউ অবশিষ্ট থাকেনি।

আলোচ্য আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোনো জাতির প্রতি অকস্মাৎ আযাব নাযিল করেন না, বরং প্রথমে হুঁশিয়ারির জন্য অল্প শাস্তি অবতারণ করেন। এতে ভাগ্যবান লোক অসাবধানতা পরিহার করে বিশুদ্ধ পথ অবলম্বন করার সুযোগ পায়। আরো জানা গেল যে ইহকালে সাজা হিসেবে যে কষ্ট ও বিপদ আসে, তা সাজার আকারে হলেও প্রকৃত সাজা তা নয়, বরং অসাবধানতা থেকে সজাগ করাই তার উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, এটি সাক্ষাৎ করুণা। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে–

ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون

অর্থাৎ আমি তাদেরকে বড় আযাবের স্বাদ গ্রহণ করানোর পূর্বে একটি ছোট আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাই, যাতে তারা সত্যকে উপলব্ধি করে ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরে আসে।

এসব আয়াত দ্বারাই এ সন্দেহ দূর হয়ে যায় যে ইহকাল প্রতিদান জগৎ নয়, বরং কর্মজগৎ। এখানে সৎ-অসৎ, ভালো-মন্দ একই পাল্লায় ওজন করা হয়; বরং অসৎ লোক সৎ লোকের চেয়ে অধিক সুখে থাকে। অতএব এ জগতে শাস্তি কার্যকর করার অর্থ কী? এ সন্দেহের উত্তর সুস্পষ্ট। অর্থাৎ আসল প্রতিদান ও শাস্তি কিয়ামতেই হবে। তাই কিয়ামতের অপর নাম 'ইয়াওমুদ্দীন' প্রতিদান দিবস। কিন্তু আযাবের নমুনা হিসেবে কিছু কষ্ট এবং সাওয়াবের নমুনা হিসেবে কিছু সুখ করুণাবশত ইহজগতে প্রেরণ করা হয়। কোনো কোনো সাধক বলেছেন, এ জগতের সব সুখ ও আরাম জান্নাতের সুখেরই নমুনা, যাতে মানুষ জান্নাতের প্রতি আগ্রহী হয়। পক্ষান্তরে দুনিয়াতে যত কষ্ট, বিপদ ও দুঃখ রয়েছে, সব পরকালের শাস্তিরই নমুনা, যাতে মানুষ জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়। বলা বাহুল্য, নমুনা ব্যতীত কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহও সৃষ্টি করা যায় না এবং কোনো কিছু থেকে ভীতি প্রদর্শনও করা যায় না।

মোটকথা, দুনিয়ার সুখ ও কষ্ট প্রকৃত শাস্তি ও প্রতিদান নয়, বরং শাস্তি ও প্রতিদানের নমুনা মাত্র। সমগ্র বিশ্বজগৎ পরকালের একটি শোরুম। ব্যবসায়ী পণ্যদ্রব্যের নমুনা দেখানোর জন্য দোকানের অগ্রভাগে একটি শোরুম সাজিয়ে রাখে, যাতে নমুনা দেখে ক্রেতার মনে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। অতএব বোঝা গেল, দুনিয়ার কষ্ট ও সুখ প্রকৃতপক্ষে শাস্তি ও প্রতিদান নয়, বরং স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠার একটি কৌশল মাত্র।

আলোচ্য আয়াতের শেষ ভাগেও لعلهم يتضرعون বাক্যে এ তাৎপর্যটিরই উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি তাদেরকে দুনিয়াতে যে কষ্ট ও বিপদে জড়িত করেছি, এর উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে শাস্তিদান নয়, বরং এ পরীক্ষায় ফেলে আমার দিকে আকৃষ্ট করাই ছিল উদ্দেশ্য। কারণ স্বাভাবিকভাবেই বিপদে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। এতে বোঝা গেল, দুনিয়াতে আযাব হিসেবেও যে কষ্ট ও বিপদ কোনো ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের ওপর পতিত হয়, তাতেও একদিক দিয়ে আল্লাহর রহমত কার্যরত থাকে।

এরপর তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে–

فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ

অর্থাৎ তাদের অবাধ্যতা যখন সীমা অতিক্রম করতে থাকে, তখন তাদেরকে একটি বিপজ্জনক পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। অর্থাৎ তাদের জন্য দুনিয়ার নিয়ামত, সুখ ও সাফল্যের দ্বার খুলে দেওয়া হয়।

এতে সাধারণ মানুষকে এই বলে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে দুনিয়াতে কোনো ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদের প্রাচুর্য দেখে ধোঁকা খেয়ো না যে তারাই বুঝি বিশুদ্ধ পথে রয়েছে এবং সফল জীবন যাপন করছে। অনেক সময় আযাবে পতিত অবাধ্য জাতিসমূহেরও এরূপ অবস্থা হয়ে থাকে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত এই যে তাদেরকে অকস্মাৎ কঠোর আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করা হবে। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন তোমরা দেখো যে, কোনো ব্যক্তির ওপর নিয়ামত ও ধন-দৌলতের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে, অথচ সে গোনাহ ও অবাধ্যতায় অটল, তখন বুঝে নেবে, তাকে ঢিলা দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ তার এ ভোগবিলাস কঠোর আযাবে গ্রেফতার হওয়ারই পূর্বাভাস। (ইবনে কাসীর)

তাফসীরবিদ ইবনে-জারীর ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো জাতিকে টিকিয়ে রাখতে ও উন্নত করতে চান, তখন তাদের মধ্যে দুটি গুণ সৃষ্টি করে দেন। এক, প্রত্যেক কাজে সমতা ও মধ্যবর্তিতা; দুই, সাধুতা ও পবিত্রতা। অর্থাৎ অসত্য বিষয় ব্যবহারে বিরত থাকা। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো জাতিকে ধ্বংস ও বরবাদ করতে চান, তখন তাদের জন্য বিশ্বাসভঙ্গ ও আত্মসাতের দ্বার খুলে দেন। অর্থাৎ বিশ্বাস ভঙ্গ ও কুকর্ম সত্ত্বেও তারা দুনিয়াতে সফল বলে মনে হয়। শেষ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহর ব্যাপক আযাব আসার ফলে অত্যাচারীদের বংশ নির্মূল হয়ে গেল। এরই পর পর বলা হয়েছে : وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে অপরাধী-অত্যাচারীদের ওপর আযাব নাযিল হওয়াও সারা বিশ্বের জন্য একটি নিয়ামত। এ জন্য আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

কোরআন মজীদের পর সর্বাধিক পঠিত কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৯

ফাজায়েলে আমালে বর্ণিত হাদীসগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর হাদীস গবেষকদের (!) অভিযোগ হলো, হাদীসগুলো সহীহ নয়। এগুলোর ওপর আমল করা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা কী? এরই অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার উচ্চতর হাদীস বিভাগের গবেষকগণ। তাঁদের গবেষণালব্ধ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে মাসিক আল-আবরার। আশা করি, এর দ্বারা নব্য গবেষকদের অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণিত হবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে হাদীসবিদ্বেষীদের।

হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে ফাজায়েলে যিকির থেকে। এখানে ফাজায়েলে যিকিরে উল্লিখিত হাদীসগুলোর নম্বর হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দূ ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

ফজায়েলে যিকির দ্বিতীয় অধ্যায় :

হাদীস : ১

جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ، يَقُولُ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحَمْدُ لِلّٰهِ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, সর্বোত্তম যিকির হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর সর্বোত্তম দোয়া হলো, আল-হামদুলিল্লাহ।

(তিরমিযী ২/১৭৬ হা. ৩৩৮৩, ইবনে মাজাহ ২/২৬৭ হা. ৩৮০০, আ'মালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ [নাসাঈ] ২৪৬ হা. ৮৩৭, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫০৩ হা. ১৮৫২, সহীহে ইবনে হিব্বান ৩/১২৬ হা. ৮৪৬, শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ৪/৯০ হা. ৪৩৭১, শরহুস সুন্নাহ ৫/৪৯ হা. ১২৬৯)

হাদীসটির মান : সহীহ

ক. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে সে যেন এরপর আল-হামদুলিল্লাহও পড়ে নেয়। কারণ আল্লাহ পাক কোরআন মজীদে فادعوه مخلصين له الدين এর পরে الحمد لله رب العالمين উল্লেখ করেছেন।

عن ابن عباسؓ قال من قال لا اله الا الله فليقل على اثرها الحمد لله رب العالمين فذلك قوله فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين

(মুসতাদরাকে হাকেম হা. ৩৬৩৯, তাফসীরে তাবারী ১১/৫৩)

হাদীসটির মান : সহীহ

খ. সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, যত দিন পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে একজনও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলনেওয়ালা থাকবে, তত দিন পর্যন্ত কিয়ামত হতে পারে না।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ :لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

(সহীহে ইবনে হিব্বান ১৫/২৬২ হা. ৬৮৪৮, মুসতাদরাকে হাকেম ৪/৫৪০ হা. ৮৫১২, মুসনাদে আহমদ ৩/২৬৮ জা, ১৩৮৩৩)

হাদীসটির মান : সহীহ

গ. হাদীসে আছে, যত দিন পর্যন্ত জমিনের বুকে একজনও আল্লাহ আল্লাহ বলনেওয়ালা থাকবে কেয়ামত হবে না।

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ :اللهُ، اللهُ "

(মুসলিম ১/১৩১ হা. ২৩৪, মুসনাদে আবী ইয়ালা ৩/৪১৯ হা. ৩৫১৩, মুসনাদে আবী আওয়ানা ৫/৯৪ হা. ২৯৩, ২৯৪, সহীহে ইবনে হিব্বান ১৫/২৬৩ হা. ৬৮৪৯)

হাদীসটির মান : সহীহ

হাদীস : ২

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " :قَالَ مُوسٰى :يَا رَبِّ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ بِهِ وَأَدْعُوكَ بِهِ، قَالَ :يَا مُوسٰى :لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ مُوسَى :يَا رَبِّ :كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَا، قَالَ :قُلْ :لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ :لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، إِنَّمَا أُرِيدُ شَيْئًا تَخُصُّنِي بِهِ، قَالَ :يَا مُوسَى، لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِي، وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ فِي كَفَّةٍ

وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فِى كَفَّةٍ مَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ "

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, একবার হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার পাক দরবারে আরজ করলেন, হে আল্লাহ! আমাকে এমন কোনো ওজীফা শিখিয়ে দিন, যা দ্বারা আমি আপনাকে স্মরণ করব এবং আপনাকে ডাকব। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তে থাকো। তিনি আরজ করলেন, হে পরোয়ারদিগার! এটি তো সকলেই পড়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা পুনরায় বললেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তে থাকো। হযরত মূসা (আ.) আরজ করলেন, হে আমার রব! আমি তো এমন একটি বিশেষ জিনিস চাইছি, যা একমাত্র আমাকেই দান করা হয়। ইরশাদ হলো, হে মূসা! সাত তবক আসমান এবং সাত তবক জমিনকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর অপর পাল্লায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রাখা হয়, তবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-ওয়ালা পাল্লাই ঝুঁকে যাবে। (সুনানে কুবরা [বায়হাকী] ৯/৩০৭ হা. ১০৬০২, সহীহে ইবনে হিব্বান ১৪/১০২ হা. ৬২১৮, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৭১০ হা. ১৯৩৬, শরহুস সুন্নাহ [বগবী] ৫/৫৪, মুসনাদে আবী ইয়ালা ২/১৩৫ হা. ১৩৮৮)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

ক. এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যিকির আল্লাহ তা'আলার বড় নেয়ামত। সুতরাং আল্লাহর শোকর আদায় করো যে, তিনি যিকিরের তওফীক দান করেছেন।

الذكر نعمة من الله فادوا شكرها

(কানযুল উম্মাল ১/৪১৪ হা. ১৭৪৯)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

হাদীস : ৩

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ :قِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلُنِى عَنْ هٰذَا الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِى يَوْمَ القِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, কেয়ামতের দিন আপনার শাফায়াত দ্বারা কোন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, হাদীসের প্রতি তোমার আগ্রহের কারণে আমার বিশ্বাস ছিল এব্যাপারে তোমার পূর্বে অন্য কেউ জিজ্ঞেস করবে না (অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে ইরশাদ করলেন) আমার শাফায়াত দ্বারা সবচেয়ে বেশি উপকৃত ও সৌভাগ্যবান ওই ব্যক্তি হবে, যে অন্তরের এখলাসের সহিত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে।

(শরহুস সুন্নাহ [বগবী] ১৫/১৬৫ হা. ৪৩৩৬, মুসতাদরাকে হাকেম ১/১৪১ হা. ২৩৩, মুসনাদে আহমদ (২/৩৭৩ হা. ৮৮৫৮, সুনানুল কুবরা [নাসাঈ] ৩/৩২৬)

হাদীসটির মান : সহীহ

ক.

এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, আমার শাফায়াত আমার উম্মতের কবীরা গোনাহওয়ালাদের জন্য হবে। (কেননা তারা নিজেদের আমলের কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে; কিন্তু কালেমা তাইয়্যেবার বরকতে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াতপ্রাপ্ত হবে।)

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :شَفَاعَتِى لِاهْلِ الكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِى

(তিরমিযী ২/৭০ হা. ২৪৩৫, আবু দাউদ ২/৬৫২ হা. ৪৭৩৯, মুসনাদে আহমদ ৩/২১৩ হা. ১৩২২২, মুসতাদরাকে হাকেম ১/১৪০ হা. ২৩০, ইবনে মাজাহ ২/৩১৯ হা. ৪৩১০)

হাদীসটির মান : সহীহ

খ. হাদীস থেকে বোঝা যায়, এক প্রকার শাফায়াত কোনো কোনো মুমিনকে জাহান্নাম হতে বের করে আনার জন্য হবে। যারা পূর্বেই জাহান্নামে দাখিল হয়ে গিয়েছিল।

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ": يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ، فَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ، فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الجَنَّةِ :الجَهَنَّمِيِّينَ "

(বুখারী ২/৯৭১ হা. ৬৫৬৬, আবু দাউদ ২/৬৫২ হা. ৪৭৪০, তিরমিযী ২/৮৭ হা. ২৬০০, ইবনে মাজাহ ২/৩২০ হা. ৪৩১৫, মুসনাদে আহমদ ৪/৪৩৪ হা. ১৯৮৯৭, মুজামুল কাবীর [তাবরানী] ১৮/৪৩৪ হা. ২৮৭)

হাদীস : ৪

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ :لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ .قِيلَ :وَمَا إِخْلَاصُهَا؟ قَالَ :أَنْ تَحْجُزَهُ عَنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

হযরত জায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি এখলাছের সাথে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কেউ জিজ্ঞাসা করল, কালেমার এখলাছ (এর আলামত) কী? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, তাকে হারাম কাজসমূহ হতে বাধা প্রদান করে।

(মুজামুল আওসাত ২/৪৯ হা. ১২৫৭, মুজামুল কাবীর ৫/১৯৭ হা. ৫০৭৪, নাওয়াদিরুল উসূল ২/৭২)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

ক.

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জামানায় এক যুবকের ইন্তেকাল হচ্ছিল, লোকেরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আরজ করল, এই যুবক কালেমা উচ্চারণ করতে পারছে না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যুবকের নিকট তশরীফ নিয়ে গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দিলের ওপর যেন একটি তালা লেগে আছে। অনুসন্ধানের পর জানা গেল, যুবকের ওপর তার মা অসন্তুষ্ট; সে মাকে কষ্ট দিয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার মাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কোনো ব্যক্তি যদি বিরাট অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে তাতে তোমার ছেলেকে নিক্ষেপ করতে উদ্যত হয়, তবে তুমি কি তাকে বাঁচানোর জন্য সুপারিশ করবে? সে আরজ করল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! করব। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যদি তা-ই হয়, তবে তোমার এই ছেলের অন্যায়কে ক্ষমা করে দাও। সে ক্ষমা করে। অতঃপর যুবককে কালেমা পড়তে বলা হলে তৎক্ষণাৎ কালেমা পড়ে নিল। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর শোকর আদায় করলেন যে তাঁর ওসীলায় যুবকটি দোযখের আগুন হতে রক্ষা পেল।

قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِى أَوْفَى، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَهُنَا غُلَامًا قَدِ احْتُضِرَ يُقَالُ لَهُ قُلْ :لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَلَا يَسْتَطِيعَ أَنْ يَقُولَهَا، قَالَ: "أَلَيْسَ قَدْ كَانَ يَقُولُهَا فِى حَيَاتِهِ؟ "قَالُوا :بَلَى، قَالَ " :فَمَا مَنَعَهُ مِنْهَا عِنْدَ مَوْتِهِ؟ "قَالَ :فَنَهَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَضْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَى الْغُلَامَ، فَقَالَ " :يَا غُلَامُ قُلْ :لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ "، قَالَ :لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَهَا، قَالَ " :وَلِمَ؟ "قَالَ: لِعُقُوقِ وَالِدَتِى، قَالَ " :أَحَيَّةٌ هِىَ؟ "قَالَ :نَعَمْ، قَالَ " :أَرْسِلُوا إِلَيْهَا "، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهَا فَجَاءَتْ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :ابْنُكِ هُوَ؟ "قَالَتْ :نَعَمْ، قَالَ " :أَرَأَيْتِ لَوْ أَنَّ نَارًا أُجِّجَتْ فَقِيلَ لَكِ :إِنْ لَمْ تَشْفَعِى لَهُ قَذَفْنَاهُ فِى هَذِهِ النَّارِ "، قَالَتْ :إِذًا كُنْتُ أَشْفَعُ لَهُ، قَالَ " :فَأَشْهِدِى اللهَ، وَأَشْهِدِينَا مَعَكِ بِأَنَّكِ قَدْ رَضِيتِ "، قَالَتْ :قَدْ رَضِيتُ عَنِ ابْنِى، قَالَ ": يَا غُلَامُ، قُلْ :لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ "، فَقَالَ :لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ "تَفَرَّدَ بِهِ فَائِدٌ أَبُو الْوَرْقَاءِ، وَلَيْسَ بِالْقَوِىِّ، وَاللهُ أَعْلَمُ

(শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ৬/১৯৭ হা. ৭৫০৮, মুসনাদে আহমদ ৪/৩৮২, তারগীব তারহীব ৩/৩২৬, মাযমাউয যাওয়ায়েদ ২/১৪৮)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

খ.

একবার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খুতবা পাঠ করলেন এবং তাতে তিনি ইরশাদ ফরমালেন, যে ব্যক্তি কোনোরূপ ভেজাল না করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। হযরত আলী (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটি বুঝিয়ে দিন যে, ভেজাল করার অর্থ কী? তিনি ইরশাদ করলেন, দুনিয়ার মহব্বত এবং তার তালাশে লেগে যাওয়া। বহু লোক এমন আছে, যারা কথা বলে নবীগণের মতো; কিন্তু কাজ করে অহংকারী ও অত্যাচারী লোকদের মতো। যদি কেউ এ কালেমাকে উক্ত রূপ কোনো কাজ না করে পড়ে, তবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ":مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ "قِيلَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا إِخْلَاصُهَا؟ قَالَ ":أَنْ تَحْجِزَهُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ ."رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ .وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ":إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَىَّ أَلَّا يَأْتِيَنِى أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِى بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَخْلِطُ بِهَا شَيْئًا إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ "قَالُوا :يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الَّذِى يُخْلَطُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ ":حِرْصًا عَلَى الدُّنْيَا وَجَمْعًا لَهَا وَمَنْعًا لَهَا، يَقُولُونَ قَوْلَ الْأَنْبِيَاءِ وَيَعْمَلُونَ أَعْمَالَ الْجَبَابِرَةِ."

(কানযুল উম্মাল ১/৫০ হা. ১৪৬, নাওয়াদিরুল উসূল ২/৭২, তাফসীরে কুরতুবী ১০/৬০)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

হাদীস : ৫

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ :قَـالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا قَـالَ عَبْـدٌ لَا إِلَـهَ إِلَّا الـلّٰـهُ قَـطُّ مُـخْـلِصًا، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، حَتّٰى تُفْضِىَ إِلَى العَرْشِ ، مَا اجْتَنَبَ الكَبَائِرَ

কোনো বান্দা এমন নেই যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে আর তার জন্য আসমানসমূহের দরজা খুলে যায় না। এমনকি এই কালেমা সোজা আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তবে শর্ত এই যে, তা পাঠকারী কবীরা গোনাহ হতে বেঁচে থাকে।

(তিরমিযী ২/১৯৯ হা. ৩৫৯০, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ [নাসাঈ] ২৪৬ হা. ৮৩৯, তারগীব তারহীব ২/২৬৭ হা. ২২৫৮, মিশকাত ২/৭১ হা. ২৩১৪, জামেউস সগীর ৪/১৫৯৭ হা. ৭৯৫৫)

হাদীসটির মান : হাসান

ক. এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, দুটি কালেমা এমন আছে যে, এর একটির জন্য আরশ পর্যন্ত পৌঁছতে কোনো বাধা নেই আর অপরটি জমিন ও আসমানকে (নিজ নূর অথবা নিজ সাওয়াব দ্বারা) ভরে দেয়। একটি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অপরটি আল্লাহু আকবার।

فَـقَالَ ابْنُ أَبِى عَمْرَةَ :سَـمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، يَقُولُ :سَمِعْتُ رَسُـولَ الـلهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " :كَـلِمَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَيْـسَ لَهَـا نَـاهِيَةٌ دُونَ الْـعَـرْشِ، وَالْأُخْرٰى تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ :لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ "فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِابْنِ أَبِى عَمْرَةَ :أَنْـتَ سَمِعْتَهُ يَقُولُ ذٰلِكَ؟ قَالَ :نَعَمْ، قَالَ :فَبَكَى عَبْدُ الـلـهِ بْـنُ عُـمَـرَ حَتّٰـى اخْتَـضَبَتْ لِحْيَتُهُ بِدُمُوعِهِ ثُمَّ قَالَ :هُمَا كَلِمَتَانِ نَعْلَقُهُما وَنَأْلَفُهُمَا

(আল মুজামুল কাবীর ২০/১৬০ হা. ৩৩৪, তারগীব তারহীব ২/২৮২ হা. ২৩১৯)

হাদীসটির মান : মকবুল

হাদীস : ৬

عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ :حَدَّثَنِى أَبِى شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، وَعُبَادَةُ بْـنُ الـصَّـامِتِ، حَاضِرٌ يُصَدِّقُهُ قَالَ :كُـنَّـا عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " :هَلْ فِيكُمْ غَرِيبٌ؟ "يَعْنِى أَهْلَ الْكِتَابِ . فَـقُلْنَا :لَا يَـا رَسُولَ الله .فَـأَمَرَ بِغَلْقِ الْبَـابِ، وَقَالَ " :ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ، وَقُولُوا :لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ "فَرَفَعْنَا أَيْدِيَنَا سَاعَةً، ثُمَّ وَضَعَ رَسُـولُ الـلـهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، ثُمَّ قَالَ " :الْحَمْدُ لِلّٰهِ، الـلهُـمَّ بَـعَثْتَـنِـى بِهٰـذِهِ الْـكَلِمَةِ، وَأَمَرْتَنِى بِهَا، وَوَعَدْتَنِى عَلَيْهَا الْـجَنَّةَ، وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ "ثُمَّ قَالَ " :أَبْشِرُوا، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ

হযরত শাদ্দাদ (রা.) বর্ণনা করেন এবং হযরত উবাদাহ্ (রা.) এ ঘটনার সমর্থন করেন যে, একবার আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, এই মজলিসে কোনো অপরিচিত (অমুসলিম) লোক নেই তো? আমরা বললাম, কেউ নেই। তখন তিনি বললেন, দরজা বন্ধ করে দাও। অতঃপর বললেন, তোমরা হাত উঠাও এবং বলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আমরা কিছুক্ষণ হাত উঠিয়ে রাখলাম (এবং কালেমা তাইয়্যেবা পড়লাম)। অতঃপর বললেন, আল-হামদুলিল্লাহ, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এই কালেমা দিয়ে পাঠিয়েছো এবং এই কালেমার ওপর জান্নাতের ওয়াদা করেছো। আর তুমি কখনও ওয়াদার খেলাফ করো না। এরপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন।

(মুসনাদে আহমদ ৪/১২৪ হা. ১৭১২৬, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫০১ হা. ১৮৪৪, মু'জামুল কাবীর [তাবরানী] ৭/২৯০ হা. ৭১৬৩, তারগীব তারহীব ২/২৬৮)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

হাদীস : ৭

عَـنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ :قَـالَ رَسُـولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ": قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ :لَـوْ أَنَّ عِبَادِى أَطَاعُونِى لَأَسْقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِـاللَّيْلِ، وَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ وَلَمَا أَسْمَعْتُهُمْ صَوْتَ الـرَّعْدِ "وَقَـالَ رَسُـولُ الـلّـهِ صَـلَّـى الـلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :جَدِّدُوا إِيـمَانَكُمْ قَالُوا :يَـا رَسُـولَ اللّٰهِ، وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيمَانَنَا؟ قَالَ ": أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ :لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ "

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, তোমরা নিজেদের ঈমানকে নতুন করতে থাকো, অর্থাৎ তাজা করতে থাকো। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঈমানকে কিভাবে নতুন করব? ইরশাদ করলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বেশি বেশি পড়তে থাকো।

(মুসনাদে আহমদ ২/৩৫৮ হা. ৮৭৩১, মুসতাদরাকে হাকেম ৪/৩৫৬ হা. ৭৬৫৭, হিলয়াতুল আওলিয়া ২/৩৫৭, জামেউস সগীর ৬/৮৬৬ হা. ৩৫৮১)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

ক.

এক হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইরশাদ বর্ণিত হয়েছে, ঈমান পুরাতন হয়ে যায়। যেমন কাপড় পুরাতন হয়ে যায়। অতএব আল্লাহ তা'আলার নিকট ঈমানের নতুনত্ব চাইতে থাকো। পুরাতন হয়ে যাওয়ার অর্থ হলো, গোনাহের কারণে ঈমানী শক্তি এবং ঈমানী নূর কমে যেতে থাকে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَخْلَقُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلَقُ الثَّوْبُ الْخَلِقُ، فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ

(মুস্তাদরাকে হাকেম ১/৫ হা. ৫, মুজামে কাবীর [তাবরানী] হা.১৪৬৬৮, মাযমাউয যাওয়াদে ১/৫২, কানযুল উম্মাল ১/২৬২ হা. ১৩১৩)

হাদীসটির মান : সহীহ

খ. এক হাদীসে এসেছে, বান্দা যখন কোনো গোনাহ করে, তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। যদি সে খাঁটিভাবে তাওবা করে তবে সেই দাগ মিটে যায়। নতুবা জমে থাকে। অতঃপর যখন আরও একটি গোনাহ করে তখন আরও একটি দাগ পড়ে যায়। এইভাবে অন্তর সম্পূর্ণ কালো ও মরিচাযুক্ত হয়ে যায়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ (كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (المطففين ١٤) .هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

(তিরমিযী ৫/৪৩৪ হা. ৩৩৩৪, ইবনে মাজাহ হা. ৪২৪৪, সহীহে ইবনে হিব্বান ৪৭৩০, মুসতাদরাকে হাকেম ২/৫১৭ হা. ১০৪৬, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লায়লাহ ৪২১)

হাদীসটির মান : সহীহ

গ. এক হাদীসে এসেছে, চারটি জিনিস মানুষের অন্তরকে ধ্বংস করে দেয়– (১) আহমকদের সাথে মোকাবিলা (২) গোনাহের আধিক্য (৩) স্ত্রী লোকদের সাথে বেশি মেলামেশা (৪) মৃত লোকদের সাথে বেশি ওঠাবসা করা। কেহ জিজ্ঞেস করল, মৃত লোক কারা? নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ওই সমস্ত ধনী ব্যক্তি, যাদের অন্তরে ধনসম্পদ অহংকার সৃষ্টি করে দিয়েছে।

وَأخرج عبد بن حميد من طَرِيق خُلَيْد بن الحكم عَن أبي الْخَيْر قَالَ :قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم :أَربع خِصَال تفْسد الْقلب :مجارلة الأحمق فَإِن جَاريته كنت مثله وَإِن سكت عَنهُ سلمت مِنْهُ وَكَثْرَة الذُّنُوب مفْسدَة الْقُلُوب وَقد قَالَ :(بل ران على قُلُوبهم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) وَالْخلْوَة بِالنسَاء والاستمتاع مِنْهُنَّ وَالْعَمَل برأيهم ومجالسة الْمَوْتَى قيل وَمَا الْمَوْتَى قَالَ :كل غَنِي قد أبطره غناهُ

(তাফসীরে রূহুল মাআনী ১৫/২৭৯, দুররে মনসূর ৬/৩২৬, তানযীহুশ শরীআহ ২/৩৯৩)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

হাদীস : ৮

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْثِرُوا مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, তোমরা বেশি বেশি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দিতে থাকো ওই সময় আসার পূর্বে যখন তোমরা এই কালেমা বলতে পারবে না।

(মুসনাদে আবু ইয়ালা ৫/৪২৩ হা. ৬১৫, আলকামেল ৪/১০৩ হা. ৯৫৩, তারগীব তারহীব ২/২৬৮, মাযমাউয যাওয়ায়েদ ১০/৮২ হা. ১৬৮০০)

হাদীসটির মান : হাসান

হাদীস : ৯

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ :إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আমি এমন একটি কালেমা জানি, যেকোনো বান্দা তা অন্তরে সত্যজ্ঞান করে পাঠ করবে এবং ওই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে জাহান্নামের জন্য হারাম হয়ে যাবে। সেই কালেমা হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

(মুসনাদে আহমদ ১/৬৩ হা. ৪৪৯, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৭০ হা. ২৪২, হিলয়াতুল আওলিয়া ৭/১৭৪, মাযমাউয যাওয়ায়েদ ১/১৫৯)

হাদীসটির মান : হাসান

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

দরসে ফিক্বহ

কোরবানী : ফাজায়েল ও মাসায়েল

মুফতী শাহেদ রহমানী

কোরবানী মুসলিম জাতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা ইসলামের মৌলিক ইবাদতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সুন্নাত হিসেবে শরীয়তে মুহাম্মাদীতেও এর বিধান আরোপিত হয়েছে। এটি শা'আইরে ইসলাম তথা ইসলামের প্রতীকীবিধানাবলির একটি, এর মাধ্যমে শা'আইরে ইসলামের বহিঃপ্রকাশ হয়ে থাকে।

রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেও প্রতি বছর তা আদায় করতেন, হাদীস ও সুন্নাহে উম্মতের সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের প্রতি তা আদায়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন এবং এর নিয়মনীতি শিক্ষা দিয়েছেন। এমনকি রাসূল (সা.) জীবনের সর্বশেষ বছর নিজে ১০০টি উট কোরবানী করেছিলেন।

এতে রয়েছে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের শিক্ষা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

'অতএব আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন।' (সূরা কাউসার : ২)

অপর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে–

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

'হে রাসূল! আপনি বলুন, আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ একমাত্র আল্লাহ রাববুল আলামীনের জন্য উৎসর্গিত। (সূরা আনআম : ১৬২)

আরো রয়েছে আল্লাহর মুহববতে নিজের সকল যুক্তি ও চাহিদাকে কোরবানী করা এবং স্বীয় প্রতিপালকের তরে নিজের সব কিছু ত্যাগ করার শিক্ষা।

কোরবানীর ফজীলত

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, কোরবানীর দিনসমূহে আল্লাহ তা'আলার নিকট কোরবানী করার চেয়ে অধিক প্রিয় কোনো আমল নেই। কোরবানীর পশু কিয়ামতের দিন তার শিং, লোম, খুরসহ আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হবে। আর কোরবানীর পশু জবাইয়ের পর রক্ত জমিনে গড়ানোর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুল হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা এতে আনন্দিত হও। (তিরমিযী, হা. ১৪৯৩)

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোরবানী কী জিনিস? উত্তরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, তা তোমাদের আদি পিতা ইবরাহীম (আ.)-এর সুন্নাত। সাহাবাগণ আরজ করলেন, তাতে আমাদের কী লাভ? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কোরবানীর পশুর প্রতিটি লোমের বিনিময় একটি সাওয়াব দেওয়া হবে। সাহাবাগণ আরজ করলেন, ভেড়ার প্রতিটি লোমের বিনিময়েও সাওয়াব দেওয়া হবে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ, ভেড়ার প্রতিটি লোমের বিনিময়েও সাওয়াব প্রদান করা হবে। (মুসতাদরাকে হাকেম ২/৩৮৯)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফাতেমা (রা.)-কে লক্ষ করে বললেন, হে ফাতেমা! তোমার কোরবানীর জন্তুর নিকটে যাও, কেননা ওই জন্তুর রক্তের প্রথম ফোঁটা বের হতেই তোমার পূর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। ফাতেমা (রা.) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই পুরস্কার কি শুধু রাসূল পরিবারের বৈশিষ্ট্য, নাকি সমস্ত মুসলমানের জন্য? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন–না, তা সকল মুসলমানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। (মুসনাদে বাযযার : হা. ১২০২)

অপর বর্ণনায় হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, তোমার কোরবানীর জন্তুর গোশত, রক্তকে সত্তর গুণ বৃদ্ধি করে তোমার আমলনামার সাথে ওজন করা হবে। (আত্তারগীব, আবুল কাসেম আসবাহানী, হা. ৩৪৮)

হযরত হুসাঈন (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি প্রশান্তচিত্তে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কোরবানী করল, ওই কোরবানী

তার জন্য জাহান্নাম থেকে প্রতিবন্ধক হবে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, {আল মু'জামুল কাবীর সূত্রে} ৪/১৭)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, ঈদের দিন কোরবানীর খরচের চেয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট অন্য কোনো খরচ বেশি পছন্দনীয় নয়। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ [আল মু'জামুল কাবীর সূত্রে] ৪/১৭)

কোরবানীর মাসায়েল

যাদের ওপর কোরবানী ওয়াজিব :

মাসআলা : প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মুসলিম নর-নারী, যে যিলহজ মাসের ১০ তারিখ সুবহে সাদিকের সময় থেকে ১২ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবে এবং ওই ব্যক্তি উক্ত তিন দিন সময়ে মুসাফিরও না হয় তার ওপর কোরবানী করা ওয়াজিব। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৬৩)

মাসআলা : নাবালেগ শিশু-কিশোর ও অসুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তি নেসাবের মালিক হলেও তাদের ওপর কোরবানী ওয়াজিব নয়। হ্যাঁ, তাদের অভিভাবক নিজ সম্পদ দ্বারা তাদের পক্ষ থেকে নফল কোরবানী করতে পারবে। (রদ্দুল মুহতার ৬/৩১৬)

মাসআলা : যদি নাবালেগ শিশু-কিশোরদের সম্পদ থেকে কোরবানী করা হয় তাহলে তা থেকে কেবল সে-ই খেতে পারবে, অন্য কেউ তা খেতে পারবে না। (আদ্দর্‌রুল মুখতার মাআর রাদ্দিল মুহতার ৬/৩১৭)

মাসআলা : কোরবানীর দিনগুলোতে মুসাফির থাকলে (অর্থাৎ ৪৮ মাইল বা প্রায় ৭৮ কিলোমিটার দূরে যাওয়ার নিয়্যাতে যে ব্যক্তি নিজ এলাকা ত্যাগ করেছে) তার ওপর কোরবানী ওয়াজিব হয় না। ১২ যিলহজ সূর্যাস্তের পূর্বমুহূর্তে মুকীম হলেও সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর কোরবানী ওয়াজিব হয়ে যাবে। (ফাতাওয়া কাযীখান ৩/৩৪৪, বাদায়েউস সানায়ে ৫/৬৩)

মাসআলা : কোরবানীর সময়ের প্রথম দিন মুসাফির থাকলেও পরে তৃতীয় দিন কোরবানীর সময় শেষ হওয়ার পূর্বে মুকীম হয়ে গেলে তার ওপর কোরবানী ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে প্রথম দিনে মুকীম ছিল অতঃপর তৃতীয় দিনে মুসাফির হয়ে গেছে তাহলেও তার ওপর কোরবানী ওয়াজিব থাকবে না। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৬৩, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৯)

মাসআলা : হাজী সাহেবানদের মধ্যে যারা কোরবানীর দিনগুলোতে মুসাফির থাকবেন, তাঁদের ওপর ঈদুল আযহার কোরবানী ওয়াজিব নয়। কিন্তু যে হাজী কোরবানীর কোনো দিন মুকীম থাকবেন সামর্থ্যবান হলে তাঁর ওপর ঈদুল আযহার কোরবানী করা ওয়াজিব হবে। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯৩, আদ্দুররুল মুখতার মাআর রাদ্দিল মুহতার ৬/৩১৫)

মাসআলা : একান্নভুক্ত পরিবারের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির কাছে নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে তাদের প্রত্যেকের ওপর ভিন্ন ভিন্ন কোরবানী ওয়াজিব হবে। (কিফায়াতুল মুফতী ৮/১৭৮)

কোরবানীর নেসাব :

মাসআলা : কোরবানীর দিনগুলোতে সাড়ে সাত (৭.৫) ভরি সোনা, সাড়ে বয়ান্ন (৫২.৫) ভরি রুপা বা ওই পরিমাণ রুপার সমমূল্যের নগদ অর্থ অথবা বর্তমানে বসবাস ও খোরাকির প্রয়োজন আসে না এমন জমি, প্রয়োজনাতিরিক্ত বাড়ি, ব্যবসায়িক পণ্য ও প্রয়োজনাতিরিক্ত অন্য আসবাবপত্রের মালিক হলে তার ওপর কোরবানী ওয়াজিব হবে। (মাবসূতে সারাখসী ১২/৮, রদ্দুল মুহতার ৬/৬৫)

মাসআলা : সোনা বা রুপা কিংবা টাকা-পয়সা এগুলোর কোনো একটি যদি পৃথকভাবে নেসাব পরিমাণ না থাকে কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত একাধিক বস্তু মিলে সাড়ে বায়ান্ন ভরি রুপার সমমূল্যের হয়ে যায় তাহলেও তার ওপর কোরবানী করা ওয়াজিব। যেমন কারো নিকট কিছু স্বর্ণ ও কিছু টাকা আছে, যা সর্ব মোট সাড়ে বায়ান্ন ভরি রুপার মূল্যের সমান হয় তাহলে তার ওপরও কোরবানী ওয়াজিব। (রদ্দুল মুহতার ৫/২১৯)

স্মর্তব্য যে, কোরবানীর নেসাব পূর্ণ হওয়ার জন্য যাকাতের ন্যায় সম্পদের ওপর বর্ষ অতিক্রম হওয়া শর্ত নয়, শুধু কোরবানীর তিন দিন নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়াই যথেষ্ট। এমনকি ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বক্ষণেও নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে গেলে কুরবানী ওয়াজিব হবে। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৬২)

মাসআলা : দরিদ্র ব্যক্তি যে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয় তার ওপর কোরবানী করা ওয়াজিব নয়; তবে সে কোরবানীর নিয়্যাতে পশু খরিদ করলে ওই পশুটি কোরবানী করা তার ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৬২)

মাসআলা : কোরবানী সম্পূর্ণ হালাল সম্পদ থেকে করতে হবে। হারাম টাকা দ্বারা কোরবানী করা সহীহ নয় এবং এ ক্ষেত্রে অন্য শরীকদের কোরবানীও সহীহ হবে না। (আহসানুল ফাতাওয়া ৭/৫০৩)

মাসআলা : কোরবানীর পশু চুরি হয়ে

গেলে বা মরে গেলে ধনী ব্যক্তির আরেকটি পশু কোরবানী করতে হবে। গরিব (যার ওপর কোরবানী ওয়াজিব নয়) হলে তার জন্য আরেকটি কোরবানী করা ওয়াজিব নয়। (খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩১৯)

মাসআলা : কোরবানীর পশু হারিয়ে যাওয়ার পর যদি আরেকটি কেনা হয় এবং পরে হারানোটিও পাওয়া যায় তাহলে কোরবানীদাতা গরিব (যার ওপর কোরবানী ওয়াজিব নয়) হলে দুটি পশুই কোরবানী করা ওয়াজিব। আর ধনী হলে কোনো একটি কোরবানী করলেই যথেষ্ট। (সুনানে বায়হাকী ৫/২৪৪, কাযীখান ৩/৩৪৭)

কোরবানীতে নিয়্যাত পরিশুদ্ধ করা :

মাসআলা : কোরবানী একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পালন করতে হবে। এ ছাড়া লোকদেখানো বা গোশত খাওয়ার নিয়্যাতে কোরবানী করলে তা সহীহ হবে না। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৭১)

মাসআলা : অংশীদারী কোরবানীতে কোনো অংশীদারেরও আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য নিয়্যাত হলে শরীকদের কারো কোরবানীই সহীহ হবে না। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শরীক নির্বাচন করা জরুরি। (আল বাহরুর রায়েক ৮/২০২)

অন্যজনের পক্ষ থেকে কোরবানী করা :

মাসআলা : অন্যের ওয়াজিব কোরবানী দিতে চাইলে ওই ব্যক্তির অনুমতি নিতে হবে, নতুবা ওই ব্যক্তির কোরবানী আদায় হবে না। অবশ্য স্বামী বা পিতা যদি স্ত্রী বা সন্তানের অনুমতি ব্যতীত তাদের পক্ষ থেকে কোরবানী করার নিয়ম সর্বদা থাকে এবং এ ব্যাপারে তাদের জানাশোনা থাকে তাহলে তাদের প্রত্যক্ষ অনুমতি ব্যতীতও কোরবানী আদায় হয়ে যাবে। তবে অনুমতি নিয়ে করা ভালো। (রদ্দুল মুহতার ৬/৩১৫)

মাসআলা : মৃত ব্যক্তি যদি ওসিয়ত না করে থাকে তাহলে তাদের পক্ষ থেকে নফল কোরবানী করা উত্তম। এর গোশত কোরবানীর স্বাভাবিক গোশতের মতো তা নিজেরাও খেতে পারবে এবং আত্মীয়স্বজনকেও দিতে পারবে। আর যদি মৃত ব্যক্তি কোরবানীর ওসিয়ত করে গিয়ে থাকে তবে এর গোশত নিজেরা খেতে পারবে না। গরিব-মিসকীনদের মাঝে সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব। (রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৬, কাযীখান ৩/৩৫২)

মাসআলা : সামর্থ্যবান ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে কোরবানী করা উত্তম। এটি বড় সৌভাগ্যের বিষয়ও বটে। আর এ কোরবানীর গোশতের বিধান নিজের কোরবানীর ন্যায় দাতা ও তার পরিবার সকলেই খেতে পারবে। (ফাতাওয়া রশীদিয়া, পৃ. ৫৮৯)

হযরত হানাশ (রহ.) বলেন, আমি হযরত আলী (রা.)-কে দুটি বকরি কোরবানী করতে দেখে তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে ওসিয়ত করেছিলেন যে, আমি যেন তাঁর পক্ষ থেকে কোরবানী করি, তাই আমি প্রতি বছর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ থেকেও কোরবানী করে থাকি। (সুনানে আবী দাউদ, হা. ২৭৯০)

মাসআলা : মৃতের পক্ষ থেকে যেমনিভাবে ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কোরবানী করা জায়েয, তদ্রূপ জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকেও তার ঈসালে সাওয়াবের জন্য নফল কোরবানী করা জায়েয। এ কোরবানীর গোশত দাতা ও তার পরিবারসহ সকলেই খেতে পারবে। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৬৭)

মাসআলা : বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তির জন্য নিজ দেশে বা অন্য কোথাও কোরবানী করা জায়েয। এক্ষেত্রে যার পক্ষ থেকে কোরবানী করা হবে তার দেশে কোরবানীর দিন হওয়া জরুরী। (রদ্দুল মুহতার ৬/৩১৮)

মাসআলা : কোরবানীদাতা এক স্থানে আর কোরবানীর পশু ভিন্ন স্থানে থাকলে কোরবানীদাতার ঈদের নামায পড়া বা না পড়া ধর্তব্য নয়; বরং পশু যে এলাকায় আছে, ওই এলাকায় ঈদের জামাত হয়ে গেলে পশু জবাই করা যাবে। (আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৮)

কোরবানীর সময় :

মাসআলা : কোরবানীর সময় হলো, যিলহজ মাসের ১০ তারিখ থেকে ১২ তারিখ সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত মোট তিন দিন। সবচেয়ে উত্তম হলো, প্রথম দিন কুরবানী করা, এরপর দ্বিতীয় দিন, এরপর তৃতীয় দিন। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৭৩; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯৫)

মাসআলা : যেসব এলাকায় জুমু'আ ও ঈদের নামায ওয়াজিব, সেসব এলাকায় ঈদের নামাযের আগে কোরবানী করা জায়েয নয়। অবশ্য অধিক বৃষ্টিবাদল বা অন্য কোনো ওজরে যদি প্রথম দিন ঈদের নামায না হয় তাহলে সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলার পর প্রথম দিনেও কোরবানী করা জায়েয হবে। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৭৩, রদ্দুল মুহতার ৬/৩১৮)

হযরত বারা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, ঈদের দিন আমরা প্রথমে নামায আদায় করি, অতঃপর ফিরে এসে কোরবানী করি। যে ব্যক্তি এভাবে আদায় করবে সে আমাদের নিয়মমতো করল। আর যে নামাযের

আগেই পশু জবাই করল, সেটা তার পরিবারের জন্য গোশত হবে, এটা কোরবানী হবে না। (সহীহ বুখারী, হা. ৫৫৪৫)

মাসআলা : ১০ ও ১১ যিলহজ দিবাগত রাতেও কোরবানী করা জায়েয। তবে দিনে কোরবানী করাই উত্তম। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৭৩, কাযীখান ৩/৩৪৫, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩২০)

মাসআলা : কোনো ব্যক্তি কোরবানীর দিনগুলোতে ওয়াজিব কোরবানী আদায় করতে না পারলে কোরবানীর পশু ক্রয় না করে থাকলে তার ওপর কোরবানীর উপযুক্ত একটি ছাগলের মূল্য সদকা করা ওয়াজিব। আর যদি পশু ক্রয় করেছিল, কিন্তু কোনো কারণে কোরবানী দেওয়া হয়নি তাহলে ওই পশু জীবিত সদকা করে দেবে। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৬৮, ফাতাওয়া কাযীখান ৩/৩৪৫)

মাসআলা : খরিদকৃত পশু কোরবানীর দিনগুলোতে জবাই করতে না পারলে তা সদকা করে দেবে। তবে সময়ের পরে জবাই করে ফেললে পুরো গোশত সদকা করে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে গোশতের মূল্য যদি জীবিত পশুর চেয়ে কমে যায় তাহলে যে পরিমাণ মূল্য কমবে তা-ও সদকা করতে হবে। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৬৮, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩২০-৩২১)

যেসব পশু দ্বারা কোরবানী করা যায় :

মাসআলা : গৃহপালিত উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা এগুলোর নর-মাদি উভয়টি দ্বারাই কোরবানী করা জায়েয। এসব পশু ছাড়া অন্যান্য পশু যেমন হরিণ, বন্য গরু-গয়াল ইত্যাদি দ্বারা কোরবানী করা জায়েয নয়। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৬৯, কাযীখান ৩/৩৪৮)

মাসআলা : কোরবানীর পশু মোটাতাজা, হৃষ্টপুষ্ট ও নিখুঁত হওয়া উত্তম। (মুসনাদে আহমদ, হা. ১৫৫৩৩)

মাসআলা : খাশীকৃত জন্তু দ্বারা কোরবানী করা জায়েয, বরং উত্তম। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হা. ৩১১৩)

কোরবানীর পশুর বয়স :

মাসআলা : উট কমপক্ষে ৫ বছরের হতে হবে। গরু ও মহিষ কমপক্ষে ২ বছরের হতে হবে। আর ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা কমপক্ষে ১ বছরের হতে হবে। এর চেয়ে এক দিন কম হলেও কোরবানী হবে না। তবে ৬ মাসোর্ধ্ব ভেড়া ও দুম্বা যদি ১ বছরের কিছু কমও হয়, কিন্তু এমন হৃষ্টপুষ্ট হয় যে দেখতে ১ বছরের মতো মনে হয় তাহলে তা দ্বারাও কোরবানী করা জায়েয। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৭০)

উল্লেখ্য, ছাগলের বয়স ১ বছরের কম হলে কোনো অবস্থাতেই তা দ্বারা কোরবানী জায়েয হবে না। (কাযীখান ৩/৩৪৮)

মাসআলা : কোরবানীর পশুর বয়সের হিসাব আরবি বর্ষ হিসেবে ধর্তব্য হবে, এতে ইংরেজি বর্ষ থেকে সাধারণত এগারো দিন কমে বর্ষ পূর্ণ হয়। (কিফায়াতুল মুফতী ৮/২১৭)

শরীকে কোরবানী করা :

মাসআলা : ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা দ্বারা শুধু একজনই কোরবানী দিতে পারবে। এগুলো দ্বারা একাধিক ব্যক্তি মিলে কোরবানী করা সহীহ হবে না। আর উট, গরু ও মহিষে সর্বোচ্চ সাতজন শরীক হতে পারবে। সাতের অধিক শরীক হলে কারো কোরবানী সহীহ হবে না। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৭০, কাযীখান ৩/৩৪৯)

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে হজ করেছিলাম, তখন আমরা সাতজন করে একটি উট এবং একটি গরুতে শরীক হয়ে কোরবানী করেছি। (সহীহ মুসলিম, হা. ১৩১৮)

মাসআলা : উট, গরু ও মহিষ সাত ভাগে এবং সাতের কমে যেকোনো সংখ্যা যেমন দুই, তিন, চার, পাঁচ ও ছয় ভাগে কোরবানী করা জায়েয। (হিন্দিয়া ৫/৩০৪)

মাসআলা : শরীকে কোরবানী করলে কারো অংশ এক-সপ্তমাংশের কম হতে পারবে না, এমন হলে কোনো শরীকেরই কোরবানী সহীহ হবে না। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৭১)

মাসআলা : যদি কেউ গরু, মহিষ বা উট একা কোরবানী দেওয়ার নিয়্যাতে কিনে আর সে ধনী হয় তাহলে তার জন্য এ পশুতে অন্যকে শরীক করা জায়েয হলেও শরীক না করে একা কোরবানী করাই শ্রেয়। শরীক করলে ওই অংশের টাকা সদকা করে দেওয়া উত্তম। আর যদি ওই ব্যক্তি গরিব হয়, যার ওপর কোরবানী করা ওয়াজিব নয়, তাহলে যেহেতু কোরবানীর নিয়্যাতে পশুটি ক্রয় করার মাধ্যমে লোকটি তার পুরোটাই আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছে, তাই তার জন্য এ পশুতে অন্যকে শরীক করা জায়েয নয়। যদি শরীক করে তবে ওই টাকা সদকা করে দেওয়া জরুরি। গরিব ব্যক্তি কোরবানীর পশুতে কাউকে শরীক করতে চাইলে পশু ক্রয়ের সময়ই নিয়্যাত করে নিতে হবে। (হেদায়া ৪/৪৪৩, কাযীখান ৩/৩৫০-৩৫১)

মাসআলা : শরীকে কোরবানী করলে ওজন করে গোশত বণ্টন করতে হবে। অনুমান করে ভাগ করা জায়েয নেই। (আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৭, কাযীখান ৩/৩৫১)

দুর্বল ও ত্রুটিযুক্ত পশুর কোরবানী :

হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদেশ করেছেন, বেশি খোঁড়া, অন্ধ, অধিক রুগ্ণ, অতিশয় ক্ষীণ দুর্বল পশু দ্বারা কোরবানী করা জায়েয নয়। (জামে তিরমিযী, হা. ১৪৯৭)

হযরত আলী (রা.) বলেন, আমাদের রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদেশ করেছেন, আমরা যেন কোরবানীর পশুর চোখ ও কান ভালো করে দেখে নিই এবং কান কাটা, কান ছেঁড়া বা কানে গোলাকার ছিদ্র করা পশু দ্বারা কোরবানী না করি। (সুনানে আবী দাউদ, হাদীস : ২৮০৪)

মাসআলা : অতিশয় ক্ষীণ দুর্বল পশু, যা জবাইয়ের স্থান পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারে না তা দ্বারা কোরবানী করা সহীহ নয়। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৭৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯৭)

মাসআলা : যে পশুর দুটি চোখই অন্ধ বা এক চোখ পুরো নষ্ট সে পশু দ্বারা কোরবানী করা সহীহ নয়। (কাযীখান ৩/৩৫২, বাদায়েউস সানায়ে ৫/৭৫)

মাসআলা : যে পশুর একটি দাঁতও নেই বা এ পরিমাণ দাঁত পড়ে গেছে যে খাদ্য চিবোতে পারে না–এমন পশু দ্বারা কোরবানী করা সহীহ নয়। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৭৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯৮)

মাসআলা : যে পশুর শিং একেবারে গোড়া থেকে ভেঙে গেছে, যে কারণে মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে পশু দ্বারা কোরবানী জায়েয নয়। পক্ষান্তরে যে পশুর অর্ধেক শিং বা তার চেয়ে কম অংশ ফেটে বা ভেঙে গেছে বা সৃষ্টিগতভাবে শিং একেবারে উঠেইনি সে পশু দ্বারা কোরবানী করা জায়েয। (জামে তিরমিযী ১/২৭৬, সুনানে আবী দাউদ, হাঃ ৩৮৮, রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৪)

মাসআলা : দুম্বা ব্যতীত অন্যান্য পশুর ক্ষেত্রে লেজ না থাকলে বা কোনো কান অর্ধেক বা তারও বেশি কাটা হলে সে পশুর কোরবানী জায়েয নয়। আর যদি অর্ধেকের বেশি থাকে তাহলে তার কোরবানী জায়েয। তবে জন্মগতভাবেই যদি কান ছোট হয় তাহলে অসুবিধা নেই। (জামে তিরমিযী ১/২৭৫, কাযীখান ৩/৩৫২, রদ্দুল মুহতার ৫/২০৬)

মাসআলা : কোরবানীর নিয়্যাতে ভালো পশু কেনার পর যদি তাতে এমন কোনো দোষ দেখা দেয় যে কারণে কোরবানী জায়েয হয় না তাহলে ওই পশুর কোরবানী সহীহ হবে না। এর স্থলে আরেকটি পশু কোরবানী করতে হবে। তবে ক্রেতা গরিব হলে ত্রুটিযুক্ত পশু দ্বারাই কোরবানী করতে পারবে। (খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩১৯, বাদায়েউস সানায়ে ৫/৭৬, রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৫)

মাসআলা : জবাইয়ের সময় ধস্তাধস্তির কারণে ভালো পশু যদি এমন কোনো ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়, যার দরুন কোরবানী সহীহ হয় না তবুও ধনী-গরিব সকলেই তা দ্বারা কোরবানী করতে পারবে। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৭৬)

গর্ভবতী পশুর কোরবানী :

মাসআলা : গর্ভবতী পশু দ্বারা কোরবানী জায়েয, তবে প্রসবের সময় আসন্ন হলে সে পশু কোরবানী করা মাকরূহ। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৭৯, ফাতাওয়া কাযীখান ৩/৩৫০)

মাসআলা : জবাইয়ের পর যদি বাচ্চা জীবিত পাওয়া যায় তাহলে সেটাও জবাই করা ওয়াজিব, তা জবাই না করে রেখে দিলে কোরবানীর দিন অতিক্রম হয়ে গেলে তা সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব। (কাযীখান ৩/৩৫০)

পশু জবাই করার বিধান :

মাসআলা : নিজের কোরবানীর পশু নিজেই জবাই করা উত্তম। নিজে না পারলে অন্যকে দিয়েও জবাই করাতে পারবে। এ ক্ষেত্রে সম্ভব হলে কোরবানীদাতা জবাইস্থলে উপস্থিত থাকা ভালো। (মুসনাদে আহমাদ ২২৬৫৭, বাদায়েউস সানায়ে ৫/৭৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০০)

মাসআলা : জবাইকারী ও তার সাথে ছুরি ধরায় অংশগ্রহণকারী উভয়েই 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে জবাই করতে হবে। ইচ্ছাকৃত কেউ বিসমিল্লাহ ছেড়ে দিলে পশু হালাল হবে না, হ্যাঁ, ভুলে হলে কোনো সমস্যা নেই। (আল বাহরুর রায়েক ৮/১৯৩)

মাসআলা : কোনো কোনো সময় জবাইকারীর জবাই সম্পন্ন হয় না, তখন কসাই বা অন্য কেউ জবাই সম্পন্ন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই উভয়কেই নিজ নিজ জবাইয়ের আগে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' পড়তে হবে। যদি কোনো একজন না পড়ে তবে ওই কোরবানী সহীহ হবে না এবং জবাইকৃত পশুও হালাল হবে না। (রদ্দুল মুহতার ৬/৩৩৪)

মাসআলা : জবাইয়ে পশুর চারটি রগের (শ্বাসনালি, খাদ্যনালি ও দুটি রক্তনালি) মধ্য থেকে তিনটি কাটা আবশ্যক, চারটি কাটাই উত্তম। (আল বাহরুর রায়েক-৮/১৯৩)

মাসআলা : ধারালো অস্ত্র দ্বারা জবাই করা উত্তম। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৮০)

মাসআলা : জবাইয়ের পর পশু নিস্তেজ হওয়ার আগে চামড়া খসানো বা অন্য

কোনো অঙ্গ কাটা মাকরূহ। জবাইয়ের সময় প্রাণীকে যথাসাধ্য কম কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করা। এক পশুকে অন্য পশুর সামনে জবাই না করা। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৮০)

মাসআলা : কোরবানীর পশু জবাই করে পারিশ্রমিক দেওয়া-নেওয়া জায়েয। তবে কোরবানীর পশুর কোনো অংশ পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া যাবে না। (কিফায়াতুল মুফতী ৮/২৬৫)

মাসআলা : কোরবানীর পশুতে অংশীদার কেউ জবাই করে অন্য শরীকদের থেকে জবাইয়ের পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয নেই। (রদ্দুল মুহতার ৫/৩৮, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/৫১৮)

কোরবানীর পশু থেকে জবাইয়ের আগে উপকৃত হওয়া :

মাসআলা : কোরবানীর পশু কেনার পর বা নির্দিষ্ট করার পর তা থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয নয়। যেমন হাল–চাষ করা, আরোহণ করা, পশম কাটা, দুধ দোহন করা ইত্যাদি। সুতরাং কোরবানীর পশু দ্বারা এসব করা যাবে না, যদি করে তবে পশমের মূল্য, হালচাষের মূল্য ইত্যাদি সদকা করে দেবে। (মুসনাদে আহমদ ২/১৪৬, বাদায়েউস সানায়ে ৫/৭৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০০)

মাসআলা : কোরবানীর পশুর দুধ পান করা যাবে না। যদি জবাইয়ের সময় আসন্ন হয় আর দুধ দোহন না করলে পশুর কষ্ট হবে না বলে মনে হয় তাহলে দোহন করবে না। প্রয়োজনে ওলানে ঠাণ্ডা পানি ছিটিয়ে দেবে, এতে দুধের চাপ কমে যাবে। যদি দুধ দোহন করে ফেলে তাহলে তা সদকা করে দিতে হবে। নিজে পান করে থাকলে মূল্য সদকা করে দেবে। (মুসনাদে আহমদ ২/১৪৬, রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৯, কাযীখান ৩/৩৫৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০১)

কোরবানীর গোশতের বিধান :

মাসআলা : কোরবানীর গোশতের এক-তৃতীয়াংশ গরিব-মিসকীনকে এবং এক-তৃতীয়াংশ আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীকে দেওয়া উত্তম। অবশ্য পুরো গোশত যদি নিজে রেখে দেয় তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৮১, আল বাহরুর রায়েক ৮/২০৩)

মাসআলা : কোরবানীর গোশত তিন দিনের চেয়ে অধিক সময় রেখে দেওয়া ও খাওয়া জায়েয। (সহীহ মুসলিম ২/১৫৯, মুয়াত্তা মালেক ১/৩১৮, বাদায়েউস সানায়ে ৫/৮১)

মাসআলা : কোরবানীর গোশত হিন্দু ও অন্য ধর্মাবলম্বীকে দেওয়া জায়েয। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০০)

মাসআলা : মান্নতকৃত কোরবানীর গোশত নিজে ও পরিবার-পরিজন খেতে পারবে না, বরং তা কোনো মুসলমান ফকীরকে সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব। (রদ্দুল মুহতার ৬/৩২১)

কোরবানীর পশুর অংশ বিক্রয় :

মাসআলা : কোরবানীর পশুর কোনো অংশ যথা– গোশত, চর্বি, হাড্ডি ইত্যাদি বিক্রি করা জায়েয নয়। বিক্রি করলে পূর্ণ মূল্য সদকা করে দিতে হবে। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৮১, কাযীখান ৩/৩৫৪)

মাসআলা : কোরবানীর পশুর চামড়া কোরবানীদাতা নিজেও ব্যবহার করতে পারবে। তবে কেউ যদি নিজে ব্যবহার না করে বিক্রি করে, তবে বিক্রির মূল্য পুরোটা সদকা করা জরুরি। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০১)

মাসআলা : কোরবানীর পশুর চামড়া বিক্রি করলে মূল্য সদকা করে দেওয়ার নিয়্যাতে বিক্রি করবে। সদকার নিয়্যাত না করে নিজের খরচের নিয়্যাত করা গোনাহ। নিয়্যাত যা-ই হোক বিক্রীত অর্থ পুরোটাই যাকাতের উপযুক্ত কাউকে সদকা করে মালিক বানিয়ে দেওয়া জরুরি। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০১, কাযীখান ৩/৩৫৪)

মাসআলা : কোরবানীর চামড়ার বিক্রীত মূল্য যাকাতের উপযুক্ত খাতে সদকা করা জরুরি, তা মাদরাসা-মসজিদ ইত্যাদির নির্মাণে খরচ করা সহীহ হবে না। (রদ্দুল মুহতার ২/৩৪৪)

কোরবানীর পশুতে ভিন্ন ইবাদতের নিয়্যাতে শরীক হওয়া :

মাসআলা : এক কোরবানীর পশুতে আকীকা, হজের কোরবানী ও অন্যান্য ইবাদতের নিয়্যাত করা যাবে। এতে প্রত্যেকের নিয়্যাতকৃত ইবাদত আদায় হয়ে যাবে। (মাবসূতে সারাখসী ৪/১৪৪, রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৬)

মাসআলা : নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী কোরবানীর গরু, মহিষ ও উটে আকীকার নিয়্যাতে শরীক হতে পারবে। এতে কোরবানী ও আকীকা দুটোই সহীহ হবে। (রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৬)

মাসআলা : যার আকীকা সে নিজে এবং তার মা-বাবাসহ সকলেই আকীকার গোশত খেতে পারবে। (ইলাউস সুনান ১৭/১২৬)

ঈদের দিন কোরবানীর গোশত দিয়ে খানা শুরু করা :

মাসআলা : ঈদুল আযহার দিন সর্বপ্রথম নিজ কোরবানীর গোশত দিয়ে খানা শুরু করা সুন্নাত। অর্থাৎ সকাল থেকে কিছু না খেয়ে প্রথমে কোরবানীর গোশত খাওয়া সুন্নাত। এই সুন্নাত শুধু ১০ যিলহজের জন্য। (জামে তিরমিযী, হা. ৫৪২, আদ্দুররুল মুখতার ২/১৭৬)

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা
শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর
অমূল্য বাণী

ইখলাস হিসেবে আমলে সাওয়াব বৃদ্ধি পায় :

দুনিয়াতেই দেখেন একটি বীজ থেকে কত ফলফলাদি আর বীজ তৈরি হয়। আমলের ক্ষেত্রে ইখলাস যত উঁচু স্তরের হবে তত বেশি নেকী মিলবে। এমনকি এক নেকী সাত শত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

খিয়ানতের গোনাহ থেকে বাঁচার উপায় :

একজন বড় মুফতী সাহেব তাঁর কাছে সব সময় দুটি কলমদানি থাকত। একটিতে তার নিজ কাজে ব্যবহৃত কলম থাকত। আরেকটিতে মাদরাসার কাজে ব্যবহৃত কলম থাকত। ব্যবহারের সময় নিজের কলম দিয়ে নিজের কাজ করতেন আর মাদরাসার কলম দিয়ে মাদরাসার কাজ করতেন। আমরাও মাদরাসার দফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বললাম কালি-কলমের ব্যবস্থা সদকা হিসেবে আপনারা নিজেরাই করেন। সকলে আনন্দচিত্তে এই প্রস্তাব মেনে নিলেন। আমার কথা হলো, কতক্ষণ পৃথক রাখবে। সুতরাং নিজের পয়সায় কেনা কলম উভয় কাজে ব্যবহার করো। এর দ্বারা মাদরাসার উপকার হবে। এগুলোও চাঁদার একপ্রকার। আরেকটি বড় উপকার হলো খেয়াতের গোনাহ থেকে বেঁচে যাবে।

যে মাদরাসার সাথে আমার সম্পর্ক তাতে চাঁদাও দিই :

যেসব মাদরাসায় আমরা শিক্ষকতা করছি, চাকরি করছি বা পড়ছি তাতে আমরা কি চাঁদা দিই? যদি না দিই তবে দেওয়া জরুরি। তা যত কমই হোক নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী চাঁদা দেওয়া উচিত। হোক তা দশ-বিশ টাকা বা বেশি। তাতে কয়েকটি উপকার। প্রথমত, কেউ যদি জিজ্ঞেস করে আপনি চাঁদা দেন। যদি আপনি চাঁদা না দেন তবে হয়তো মিথ্যা বলতে হবে অথবা দিই না বলতে হবে। উভয়টিই ভালো কথা নয়। তাই আমি আমার মাদরাসায় সকলকে বলে রেখেছি কিছু কিছু চাঁদা আপনারা দিয়ে দেবেন। মাশাআল্লাহ শিক্ষক-কর্মচারীগণ প্রফুল্লচিত্তে চাঁদা দিয়ে থাকেন। এর দ্বারা সমাজেও ভালো প্রভাব পড়ে। আবার সদকার বরকতও অর্জিত হয়।

মূল কথা হলো, ভালো কাজে সর্বদিক থেকে সহযোগিতা করা। শ্রম, সম্পদ, সময় সর্ববিদ নিয়ামতকে আল্লাহর ওয়াস্তে ব্যয় করা। সদকার কারণে সম্পদে কমতি হয় না। বরং বৃদ্ধি পায়। হযরত কারী তৈয়ব সাহেব (রহ.) হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর আমল সম্পর্কে বলেন, তিনি নিজের হাদিয়া ইত্যাদির এক-চতুর্থাংশ আল্লাহর রাস্তায় সদকা করতেন।

কমবেশ সদকা করতে থাকা :

সুতরাং খুব কমই হোক সদকা করা জরুরি। কারণ অন্তরের কথা আল্লাহ তা'আলাই জানেন এবং অন্তরসমূহ দেখেন। কারো কাছে এক টাকা আছে। সে তা থেকে দশ পয়সা সদকা করল। কারো কাছে একশ টাকা আছে সে পাঁচ টাকা সদকা করল। তখন দশ পয়সা সদকার দাম বেড়ে যাবে। কারণ সে নিজ সম্পদের এক-দশমাংশ সদকা করল। অথচ দ্বিতীয়জন বিশ ভাগের এক ভাগ সদকা করল। তাই তো বলা হয়েছে সাহাবায়ে কেরামের এক মুষ্টি সমান সদকার বরাবর পরের লোকদের উহুদ পাহাড় পরিমাণ সদকাও এর বরাবর হবে না।

মূলের দিকেই দেখতে হবে :

এক মসজিদে দেখলাম দুটি ঘড়ি আছে। একটি মসজিদের ভেতরে আরেকটি বাইরের দেয়ালে। উভয় ঘড়ির মধ্যে ৫ মিনিট সময়ের পার্থক্য। অথচ উভয় ঘড়িই একই কোম্পানির একই সময় লাগানো। এখানে কোন ঘড়িটির সময় সঠিক কোনটির ভুল তা কিভাবে নির্ণয় করা যাবে। এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক তৃতীয় আরেকটি ঘড়ি দেখা হয়। যার সময় ঠিক থাকে।

এ ধরনের সমস্যা অন্য ক্ষেত্রেও হয়। যেমন যায়েদ এবং উমর উভয়ই মাদরাসায় পড়ে। একই সময় একই শ্রেণীতে একই উস্তাদের কাছেই পড়ে। কিন্তু তাদের আখলাক-চরিত্রে বিস্তর পার্থক্য। এদের মধ্যে কে সঠিক পথে আছে আর কে বিপথগামী তা নির্ণয় করার জন্য তার উস্তাদকে দেখা যায়। তার উস্তাদকে পর্যবেক্ষণ করলে নির্ণয় করা যাবে কে সঠিক পথে আছে আর কে বিপথগামী।

এরূপ প্রত্যেক বিষয়ের সুষ্ঠুতা-অসুষ্ঠুতা নির্ণয়ে তার আসলের দিকে দেখতে হয়। আসল বা মূলের সাথে মেলালে খুব সহজে সঠিক-অসঠিক বুঝতে পারা যায়।

নিজে নিজে আত্মশুদ্ধি সম্ভব নয় :

তেমনি এই যে, ঘড়ির অসঠিক টাইম দেওয়া নিজে নিজে ঠিক হতে পারে না। বরং সেটাকে যত দিন কোনো মেকানিক ঠিক করবে না, তত দিন সে ভুল সময় দিতে থাকবে। একসময় নষ্ট হয়ে পড়বে। যদি সঠিক মেকানিকের হাতে পড়ে দেখা যাবে এক মিনিটেই ঠিক হয়ে গেছে। তদ্রূপ একজন মানুষ দীর্ঘ সময় ভুল করতে করতে একসময় সে নিজে নিজেই ঠিক হয়ে যাবে এমন নয়। হ্যাঁ কোনো মানুষ গড়ার মেকানিকের হাতে পড়লে খুব তাড়াতাড়ি ঠিক হওয়া সম্ভব।

মাওয়ায়েযে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)

বিভিন্ন সময় ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনদের উদ্দেশে দেওয়া তাকরীর থেকে সংগৃহীত

আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত ইখলাস

মানুষকে কোনো আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী ও তা করার প্রতি সচেষ্ট হতে উৎসাহ প্রদানকারী অনেক জিনিস রয়েছে। যার মধ্যে হতে কিছু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়। আর কিছু এমন আছে, যা অন্তরের গভীরে সুপ্ত থাকে। ব্যক্তি নিজেও অনেক সময় এ বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে না যে, কী তাকে এ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করছে বা কী তাকে এর থেকে নিরুৎসাহিত করছে। কারণ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী বা নিরুৎসাহিতকারী এ বস্তুটি অন্তরের গভীরে গুপ্ত ভেদের ন্যায়। যার কেন্দ্রস্থল হলো প্রবৃত্তি বা অন্তর।

মানুষের স্বভাব কী ধরনের তা সবারই জানা থাকার কথা। স্বভাবগত অবস্থা জানার সহজ উপায় হলো, আপনি নিজেই নিজের ব্যাপারে বিচার করে দেখুন। আপনার ভাবনা মানুষের বেলায় কী? যদি নিজের প্রতি অনুরাগ নিজের সম্পদের প্রতি অগাধ মহব্বত, নিজেকে নিয়ে গৌরব করা বা নিজেকে বড় হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়। তবুও অবাক হওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ মানুষের এসব বৈশিষ্ট্য তার স্বভাবে গচ্ছিত। নিজেকে বড় মনে করা, অন্যকে তুচ্ছজ্ঞান করা বা অন্যের সমকক্ষ ভাবা এবং নিজের বড়ত্ব প্রদর্শনের মানসিকতা মানুষের সাথে উঠাবসায়, কথাবার্তায় ও কাজেকর্মে প্রকাশ পেতে থাকে। আর এগুলো মানুষের মাঝে প্রতিনিয়ত হতেই থাকে।

মানুষের কাজকর্ম, কথাবার্তা এবং যাবতীয় আমলের মূলে যে জিনিসটি রয়েছে ইসলাম সেটাকেই পরখ করে। সেটা হলো ব্যক্তির নিয়্যাত। ফলে ইসলামে আমলের মূল্যায়ন নিয়্যাত দ্বারাই করা হয়। নিয়্যাত ঠিক হলে নেককাজের উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে। কারণ তার মধ্যে ইখলাস ছিল।

দেখুন! ভালো-মন্দ দুটি জিনিস মানুষের অন্তর ও প্রবৃত্তির মধ্যে প্রবেশ করে তাকে ভালো কাজ বা মন্দ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে থাকে। উৎসাহিতকরণের এই দিকটি ইতিবাচক বা নেতিবাচক যা-ই হোক না কেন, ইসলাম কিন্তু এখানে বাহবা পাওয়ার অধিকার রাখে যে, সে কোনো অবস্থাতেই ওই আমল কবুল করে না, যাতে বদনিয়্যাত শামিল হয়। যেমন কারো খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য বা লোক দেখানোর জন্য। এ ধরনের বদনিয়্যাত থেকে নিজের কলবকে পবিত্র রাখার প্রতি মনযোগী হোন। নেক কাজ যা-ই করবেন তার দ্বারা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই মুখ্য উদ্দেশ্য হতে হবে। তবেই তা কবুল হবে, নেকী হিসেবে গণ্য হবে এবং আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের নেকীর সাওয়াব ও বিনিময় প্রদান করেন।

আমলের প্রতিদান নিয়্যাতকেন্দ্রিক

নিয়্যাতকে শুদ্ধ করা ও তাকে প্রবৃত্তির চাহিদামুক্ত করার জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

অর্থাৎ আমলের প্রতিদান নিয়্যাতের ভিত্তিতেই দেওয়া হবে। অতএব যাঁর হিজরত আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর সন্তুষ্টির জন্য হবে সত্যিকারার্থে তাঁর হিজরতই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য। (অর্থাৎ সেই সত্যিকারের মুহাজির)। আর যার হিজরত দুনিয়ার কোনো স্বার্থে হবে, তবে সে দুনিয়াই পাবে। (আখিরাতে হিজরতের কোনো সাওয়াব সে পাবে না)। অথবা যার হিজরত কোনো নারীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ার জন্য হবে, তবে সে ওই নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। (কিন্তু আখিরাতে হিজরত বাবদ কোনো সাওয়াব তার আমলনামায় থাকবে না) মোটকথা হলো, যে নিয়্যাতে হিজরত করবে প্রতিদানস্বরূপ তা-ই পাবে।

উল্লিখিত হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, উম্মতের সামনে এ বিষয়টিকে পরিষ্কার করে দেওয়া যে বৈধ যেকোনো কাজ ভালো নিয়্যাতে করলে তা ভালো। আর মন্দ নিয়্যাতে করলে তা মন্দ। মোটকথা, ভালো-মন্দ নিয়্যাতের ওপর সীমাবদ্ধ। আর ভালো নিয়্যাত বলতে এটাকেই বোঝায় যে যেকোনো কাজ আল্লাহর রেজামন্দী এবং রাসূল (সা.)-এর অনুসরণে করা। মনে রাখবেন, কারো সামনে আমি এ কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করেছি বলার দ্বারাই তা ভালোয় পরিণত হবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা অন্তরের সুপ্ত ভেদ সম্পর্কেও অবগত।

والله عليم بذات الصدور

উক্ত হাদীস থেকে মুহাজির ও মুসাফিরের মধ্যে পার্থক্যও নির্ণয় হয়ে গেল। যে ব্যক্তি নিজের দ্বীন-ঈমান রক্ষার্থে মক্কা থেকে মদীনায় গিয়েছে সেখানে ইসলামী হুকুমত কায়েম করার জন্য সেই হলো মুহাজির। আর যে অন্য উদ্দেশ্যে গিয়েছে সে মুহাজির নয় বরং মুসাফির।

ইখলাসের বরকত

ইখলাস ও সহীহ নিয়্যাতে করা আমল আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন। পক্ষান্তরে ইখলাসবিহীন আমল দ্বারা

মানুষ অকৃতকার্য ও ক্ষতিগ্রস্তই হতে থাকে। তাই তো দেখুন প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ যদি ইখলাসের সাথে হয়, আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর হুকুম মোতাবেক হয় এবং নেক উদ্দেশ্যে হয় তবে তাও আল্লাহ তা'আলার কাছে মকবুল আমলে পরিগণিত হয়। যেমন–একজন পুরুষের তার বৈধ স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলনের উদ্দেশ্যে নিজের এবং স্ত্রীর পবিত্রতা সতীত্ব ইজ্জত-আবরু ও দ্বীনের হেফাজত এবং নেক সন্তান লাভ হয়, তবে তাতেও সে সাওয়াবের অধিকারী হবে। অনুরূপভাবে নিজে যা খাবে এবং বিবি ও বালবাচ্চাকে যা খাওয়াবে সব কিছুই যদি নেক নিয়্যাতের সাথে হয়, তবে তাতেও সদকার সাওয়াব দেওয়া হবে। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

عجبا للمؤمن انه يوجر فى كل شئ حتى فى اللقمة التى يرفعها الى فيه

মু'মিনের বিষয়টি আশ্চর্যজনক যে সে তার প্রতিটি কাজের বিনিময়ে সাওয়াব পেয়ে থাকে। এমনকি তার মুখে উত্থিত লোকমার বিনিময়েও। অর্থাৎ নিয়্যাত ঠিক হলে এখানেও সদকার সাওয়াব পাবে। (বুখারী)

অন্য এক হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন–

وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِى تَرْفَعُهَا إِلَى فِى امْرَأَتِكَ

অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তুমি যা খরচ করবে নিঃসন্দেহে তাও সদকা, এমনকি স্ত্রীর মুখে তোমার তুলে দেওয়া লোকমাটিও। অর্থাৎ নিয়্যাত ঠিক হলে এখানেও সদকার সওয়াব পাবে। (বুখারী)

অন্যত্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ، فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ، فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ ، فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ، فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ

"যা নিজে খাবে তা তোমার জন্য সদকা। যা তোমার সন্তানকে খাওয়াবে তাও তোমার জন্য সদকা, যা তোমার স্ত্রীকে খাওয়াবে, তাও তোমার জন্য সদকা, যা তোমার খাদেমকে খাওয়াবে, তাও তোমার জন্য সদকা।" (আহমদ)

এই হাদীস থেকেও বুঝে আসে যে ব্যয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রই উত্তম সদকায় পরিণত হবে নিয়্যাত ও ইখলাসের ওপর নির্ভর করে।

আরেক হাদীসে আছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منها انسان او طير او بهيمة الا كانت له صدقة وفى رواية مسلم وما سرق منه له صدقة

কোনো মুসলমান বৃক্ষরোপণ করল বা ক্ষেতে ফসল বুনল, অতঃপর তা থেকে কোনো মানুষ, পাখি বা চতুষ্পদ জন্তু কিছু খেয়ে ফেললে তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে।

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে, চোরও যদি তা থেকে কিছু চুরি করে নেয়, তাও তার জন্য সদকা হবে। (বুখারী-মুসলিম)

দেখুন, এখানেও নিয়্যাতের ভিত্তিতেই সাওয়াবের কথা বলা হয়েছে।

ইখলাস বৃথা যেতে পারে না

একজন মু'মিন যখন প্রতিটি কাজে নিজের মধ্যে ইখলাস পয়দা করতে পারবে, তখন তার চলাফেরা, ওঠাবসা, শুয়ে থাকা, জেগে থাকা–সব কিছুই আল্লাহর জন্য হবে এবং প্রতিটি কাজেই সাওয়াবের অধিকারী হবে। যদি শারীরিক অসুস্থতা, আর্থিক অক্ষমতা বা অন্য কোনো কারণে কোনো ভালো কাজ করতে অপারগ হয়, তবে তার ইখলাস আন্তরিক সংকল্প দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও অদম্য ইচ্ছার কারণে না করেও সে কাজের সাওয়াব পেয়ে যাবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরের রক্তক্ষরণ ও না করতে পারার আক্ষেপ সম্পর্কে সম্যক অবগত।

দেখুন! তাবুক প্রান্তে যুদ্ধ পরিচালনা করার প্রস্তুতিকালে বে-সরু-সামান কিছু সাহাবা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে হাজির হলেন, উদ্দেশ্য রাসূল (সা.) কিছু একটা ব্যবস্থা করে তাঁদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেবেন। কিন্তু রাসূলও (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিছু ব্যবস্থা করতে না পারায় তাঁদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। নিরুপায় হয়ে তাঁরা মদীনাতেই থেকে যান। কিন্তু ইখলাসের বদৌলতে স্বশরীরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করেও অংশগ্রহণের সাওয়াব পেয়ে যান। তাঁদের ব্যাপারেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا، مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ

মদীনাতে কিছুসংখ্যক লোক রয়ে গেছে, আমরা পাহাড়ি যেকোনো পথ ও উপত্যকা পাড়ি দিই না কেন, তারাও সেখানে আমাদের সাথে আছে। (সাওয়াবের অধিকারী হবে) অপারগতা তাদেরকে মদীনায় থাকতে বাধ্য করেছে। (বুখারী)

চিন্তা করুন, যুদ্ধাভিযানে না থেকেও ঘরে বসে বসে তাঁরা মুজাহিদীনদের ন্যায় সাওয়াব পেলেন শুধুমাত্র ইখলাসের কারণে। মনে রাখবেন, ইখলাসের সাথে কোনো নেক কাজ করলে বা করার ইচ্ছা করলে এর দ্বারা বরকত ও রহমতের ফুল ফোটে। আর ইখলাসের সাথে করা সামান্য নেকীর সাওয়াবও পাহাড়সম হয়। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

اخلص دينك يكفيك العمل القليل

"নিয়্যাত দূরস্ত করো অল্প আমলই নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে।" (মুস্তাদরাক)

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে প্রতিটি কাজ ইখলাসের সাথে করার তাওফীক দান করুন। আমীন.....

গ্রন্থনা : মুফতী নুর মুহাম্মদ

গায়রে মুকাল্লিদদের ইমাম মরহুম আলবানী সাহেবের প্রকৃত পরিচয়

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

আলবানী সাহেবের আসল নাম নাসিরুদ্দীন। সিরিয়ার অন্তর্গত আলবেনিয়ার অধিবাসী হওয়ায় তাঁকে আলবানী বলা হয়। এ নামেই তিনি সারা বিশ্বে পরিচিত। ১৩৩৩ হিজরী মোতাবেক ১৯১৪ ঈসাঈতে তিনি আলবেনিয়ার আশকুদারাহ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। কিছু সমস্যার কারণে তাঁর পিতা আলবেনিয়া ছেড়ে সপরিবারে দামেস্ক চলে যান সাথে আলবানীকেও নিয়ে যান। আলবানী সাহেব দামেস্ক থাকাকালীন পিতার কাছে কোরআনে কারীম হিফজ করেন। দামেস্কের 'মাদরাসায় ইস'আফ আল খায়রিয়া'তে প্রাথমিক পড়াশোনা করেন। কিন্তু পিতৃ পেশা ঘড়ি মেরামতের কাজে সময় দেওয়ার কারণে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বা শাস্ত্রাভিজ্ঞ কোনো আলেমের তত্ত্বাবধানে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কিতাবাদি ও তাফসীর, হাদীস, উসূলে হাদীসের কোনো কিতাবের পাঠ গ্রহণ করার সুযোগ তাঁর হয়নি। এ বিষয়টি তাঁরই সুপরিচিত আরবের বিখ্যাত আলেমেদীন শাইখ মুহাম্মদ আওয়ামা তাঁর রচিত 'আসারুল-হাদীস' গ্রন্থে এভাবে ব্যক্ত করেছেন।

مع أن هذا الرجل ليس له من الشيوخ إلا شيخ واحد من علماء حلب بالإجازة لا بالتلقى و الأخذ و المصاحبة و الملازمة - اثر الحديث صـ ١٥

'পাশাপাশি এই ব্যক্তির কোনো উস্তাদ ও নেই (যাঁর কাছে তিনি হাদীস পড়েছেন) শুধুমাত্র সিরিয়ার 'হালাব' শহরের জনৈক আলেম তাঁকে হাদীস চর্চার মৌখিক অনুমতি দিয়েছেন। তবে তাঁর কাছেও তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে হাদীস অধ্যয়ন করেননি।" (আসারুল-হাদীস, পৃ. ১৫)

তাঁর এই বিষয়টি সর্বজনস্বীকৃত যে, তিনি উলূমুল হাদীসের জ্ঞান কোনো বিজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট থেকে গ্রহণ করেননি। এ ব্যাপারে নিজের অধ্যয়নই তাঁর মূল ভিত্তি। অথচ শাস্ত্রীয় ব্যাপারে সর্বজনস্বীকৃত একটি মূলনীতি–অভিজ্ঞতাও যার সাক্ষ্য প্রদান করে তা হলো যেকোনো শাস্ত্রে পরিপক্বতা অর্জনের জন্য সে শাস্ত্রের পণ্ডিত ব্যক্তিদের সাহচর্য অবলম্বন করা অনিবার্য। ব্যক্তিগত অধ্যয়নে জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রীয় পরিপক্বতা শাস্ত্রীয় পণ্ডিতের সাহচর্য ছাড়া অর্জিত হওয়া বাস্তবতার নিরিখে অসম্ভব।

কিন্তু আলবানী সাহেব এই স্বীকৃত বিষয়টির কোনো তোয়াক্কা না করে নিজস্ব অধ্যয়নেই তিনি উলূমুল হাদীসের ইমাম বনে গেছেন! এমনকি তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল হাদীস ও হাদীসের সকল ইমামের বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। চিন্তা করুন, কোনো এইট পাস ব্যক্তি যদি বাজার থেকে আইনের কিছু বইপত্র ক্রয় করে নিজে নিজে অধ্যয়ন করে আন্তর্জাতিক বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তাহলে আইনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে কী ধরনের নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে! এমনিভাবে কোনো এইট পাস ছেলে যদি ডাক্তারি বইপত্র ক্রয় করে নিজে নিজে অধ্যয়ন করে বিশ্বমানের ডাক্তারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তাহলে গোরস্তান আবাদ করা ছাড়া আর কী হওয়ার সম্ভাবনা আছে?

ঠিক এই অবস্থাটাই হয়েছে জনাব আলবানী সাহেবের। ইলমে ওয়াহীর মতো স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল বিষয়ে নিজস্ব অধ্যয়নের ভিত্তিতে সকলের ইমাম বনে যাওয়া ও সকল হাদীস ও হাদীসের ইমামগণের বিচারক বনে যাওয়ার ফলে ইলমী ময়দানে যে অরাজকতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে এবং দুনিয়ায় যে ফেতনা-ফ্যাসাদ জন্ম নিয়েছে তা খুবই দুঃখজনক ও মুসলিম উম্মাহর জন্য অশনিসংকেত।

এজন্য সকল মুসলিমের জন্য আলবানী সাহেবের ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তিকর দিকগুলো সম্পর্কে সতর্ক থাকা অত্যন্ত জরুরি, যাতে মুখরোচক কোনো স্লোগান শুনে আমরা ভ্রান্ত পথের পথিক না হয়ে যাই। নিম্নে আলবানী সাহেবের ভুল-ভ্রান্তির কিছু দিক তুলে ধরা হলো :

১.হাদীসের সহীহ-যয়ীফ, জরাহ-তাদীল ও এ শাস্ত্রের নিয়ম-কানুন প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্ববিরোধী বক্তব্য :

হাদীসের সহীহ-যয়ীফ, জরাহ-তাদীল ও এ শাস্ত্রের নিয়ম-কানুন প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার স্ববিরোধী বক্তব্য সংখ্যায় প্রচুর। দেখা যায়, এক স্থানে তিনি একটি হাদীসকে সহীহ বলেছেন তো অন্য স্থানে সেটিকেই হাসান বা যয়ীফ বলেছেন। আবার এক স্থানে কোনো বর্ণনাকারীকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন তো

অন্য স্থানে তাকে যয়ীফ (দুর্বল) বলেছেন।

তার এ ধরনের স্ববিরোধী বক্তব্য একত্রিত করে শায়েখ হাসান সাক্কাফ

تناقضات الألبانى الواضحات

(আলবানীর স্পষ্ট স্ববিরোধিতাসমূহ) নামে ২ খণ্ডের একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

আবার দেখা গেছে, কোনো বর্ণনাকারীর ব্যাপারে তাঁর ধারণা পূর্বে এক রকম ছিল; কিন্তু পরে তাতে পরিবর্তন এসেছে। এ জাতীয় বিষয়াদিকে শায়খ আবুল হাসান মুহাম্মদ তাঁর

تراجع العلامة الألبانى فيما نص عليه تصحيحا و تضعيفا

কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর এ জাতীয় স্ববিরোধিতা সর্বমোট ২২২টি হাদীসের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে।

২. ইজতেহাদী বিষয়াদিতে অসহিষ্ণুতা : শাস্ত্রজ্ঞ ইমামগণ এ বাপ্যারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন পূর্ণভাবে স্বীকৃত যে, হাদীস ভাণ্ডারে বিদ্যমান হাদীসসমূহ সহীহ বা যয়ীফ হওয়ার বিবেচনায় তিন ভাগে বিভক্ত :

এক. যেসব হাদীস সহীহ হওয়ার ব্যাপারে সকল ইমাম একমত হয়েছেন।

দুই. যেসব বর্ণনা যয়ীফ বা মাতরুক (পরিত্যাজ্য) হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত হয়েছেন ।

তিন. যেসব বর্ণনা সহীহ বা যয়ীফ হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে।

বাস্তবতার নিরিখেও হাদীসের এই প্রকার তিনটি সুস্পষ্ট। এর মধ্যে প্রথম দুই প্রকার হাদীসের বিষয়টি সহজ ও পরিষ্কার। কিন্তু আলবানী সাহেব তাঁর 'সিলসিলাতুল আহাদীস'কে এই দুই প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি তাঁর কিতাবে যথারীতি শেষোক্ত প্রকারের হাদীস প্রচুর পরিমাণে উল্লেখ করেছেন। অথচ এই তৃতীয় শ্রেণীর হাদীসের ব্যাপারে শাস্ত্র ও বিবেকের সিদ্ধান্ত হলো শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি তাহকীক ও গবেষণার ভিত্তিতে যে মতটিকে সঠিক বা বিশুদ্ধ মনে করবেন, তিনি সেই মতটি অবলম্বন করবেন। আর যারা শাস্ত্র বিষেশজ্ঞ নন, তাঁরা কোনো শাস্ত্রজ্ঞের তাকলীদ বা অনুসরণ করবেন। তবে অনুসরণের ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে, মতটি যেন কোনো পণ্ডিতের পদস্খলন না হয়।

ইমাম বাইহাকী (রহ.) (মৃত্যু ৪৫৮হি.) তাঁর 'দালায়েলুন নুবুওয়্যাহ'-এর ভূমিকায় এ বিষয়টি নিম্নোক্ত ভাষায় উল্লেখ করেছেন :

وأما النوع الثالث من الأحاديث فهو حديث قد اختلف اهل العلم بالحديث فى ثبوته فهذا الذى يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم أن ينظروا فى اختلافهم ويجتهدوا فى معرفة معانيهم فى القبول و الرد ثم يختاروا من أقاويلهم أصحها و بالله التوفيق

উম্মাহর আলেমগণের কর্মনীতিও সর্বযুগে এই ছিল যে, এ প্রকারের হাদীসসমূহে বিশেষজ্ঞদের মতপার্থক্য যেহেতু সাধারণ ব্যাপার, তাই প্রত্যেকেই অপরের মতের ব্যাপারে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেছেন। যাঁর বিচার-বিবেচনায় হাদীসটিকে সহীহ মনে হয় তিনি হাদীসটিকে মাস'আলার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেন আর যাঁর বিবেচনায় হাদীসটিকে সহীহ মনে হয় না, তিনি একে মাস'আলার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন না। এ ক্ষেত্রে গ্রহণ-অগ্রহণ উভয়টিই ইজতিহাদের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। আর এ জন্যই প্রত্যেককে অপরের মতের ব্যাপারে শ্রদ্ধাশীল ও সহিষ্ণু হতে হয়। আমাদের পূর্ববর্তী ইমামগণ এমনই ছিলেন।

আলোচ্য ক্ষেত্রে নিজের মতটিকে চূড়ান্ত মনে করা বা যথাযথ দলিলভিত্তিক সমালোচনার ব্যাপারে অসহিষ্ণু হওয়া এবং সমালোচককে কটাক্ষ ও গালাগাল করা কিংবা নিজের সিদ্ধান্তকে অন্য সকলের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার মানসিকতা পোষণ করা যে অত্যন্ত গর্হিত কাজ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো, আলবানী সাহেব ও তাঁর বিশিষ্ট ভক্ত-অনুরক্ত সকলেই এ গর্হিত কাজটিতে লিপ্ত হয়ে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলেছেন। সিলসিলাতুয যয়ীফা সিলসিলাতুস সহীহা এবং তাঁর অন্যান্য রচনার ভূমিকা পড়লে একজন নিরপেক্ষ পাঠকের মনে এ ধারণাই সৃষ্টি হয় যে, তাঁর সিদ্ধান্তের সাথে একমত না হওয়াই অমার্জনীয় অপরাধ এবং এই অপরাধে অপরাধী ব্যক্তি তাঁর পক্ষ থেকে যেকোনো ধরনের (শ্রব্য-অশ্রাব্য) সম্বোধনের উপযুক্ত হতে পারে।

৩. যয়ীফ হাদীসের ব্যাপারে আলবানী সাহেবের যয়ীফ অবস্থান :

আলবানী সাহেব যয়ীফ হাদীসকে একদম অনর্থক মনে করেন। তাঁর মতে, যয়ীফ হাদীসের যতগুলো প্রকার আছে তার কোনোটিই কোনো ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি তাঁর কিতাবে যয়ীফ ও মওযু (দুর্বল ও জাল) উভয়টিকে একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং উচ্চ কণ্ঠে এ ঘোষণা দিয়েছেন যে, যয়ীফ সর্বক্ষেত্রেই পরিত্যাজ্য। অর্থাৎ এটা না ফাজায়েলের

ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য, না মুস্তাহাব বিষয়াদির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য, আর না অন্য কোনো ক্ষেত্রে। সহীহুল জামিইস সগীর ওয়া যিয়াদাতিহী, পৃ. ১৫০

অথচ এই মতটি সালাফ ও সালাফের সর্ববাদী নীতিমালার সুস্পষ্ট বিরোধী। জমহুরে সালাফ ও খালাফের ইজমা বা ঐকমত্যের খেলাফ হওয়া তো অতি স্পষ্ট এবং সর্বজনবিদিত; বাস্তব কথা হলো, তা সকল সালাফ ও খালাফের ইজমারই পরিপন্থী।

যয়ীফ হাদীস কোনোক্রমেই কাজের নয়; বরং তা বিলকুল অকেজো আলবানী সাহেবের এই মতটি অবলম্বন করেছেন সালাফ ও খালাফের কারো থেকেই প্রমাণিত নয়। তাঁরা সকলেই যয়ীফ হাদীসকে ফজীলতের ব্যাপারে গ্রহণ করেছেন। এমনকি কোনো বিষয়ে সহীহ হাদীস না থাকলে যয়ীফ হাদীস দ্বারা বিধিবিধান প্রমাণ করেছেন এবং যয়ীফ হাদীসকে কিয়াসের ওপরে মর্যাদা দিয়েছেন। –আল কাউলুল বদি ফিস সালাতি আলাল হাবিবিশ শাফিঈ, হাফেয সাখাবী, পৃ. ৪৭৩

৪. শুযুয তথা উম্মতের ঐকমত্য থেকে বিচ্যুতি :

আলবানী সাহেবের আলোচনা পর্যালোচনা শুধু হাদীসের তাসহীহ ও তাযয়ীফের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তিনি তাঁর রচনাসমূহের বিভিন্ন স্থানে ফিকহ, আকাঈদ ও অন্যান্য শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ে স্বাধীন এমনকি এক ধরনের বিচারকসুলভ পর্যালোচনা করেছেন। আর এ ক্ষেত্রে তিনি কোনো বিচ্ছিন্ন মত গ্রহণ করতে বা কোনো মনীষীর ভ্রান্তি বা বিচ্ছিন্ন সিদ্ধান্তকে জীবিতও করতে কোনো দ্বিধা করেননি। অথচ ইজমায়ে উম্মত ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকে চলে আসা উম্মাহর অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো মত পোষণ করা অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। এ ব্যাপারে শরীয়তের প্রমাণাদি, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং পরবর্তী আসলাফে উম্মাহর সিদ্ধান্ত ও বক্তব্য জ্ঞানী ব্যক্তিদের অজানা নয়। এ প্রসঙ্গে ইবনে আব্দুল বার (রহ.) প্রণীত جامع بيان العلم ২/১৩০ এবং ইবনে রজব দামেশ্কী (রহ.)-এর شرح علل الترمذى বিশেষভাবে অধ্যয়নযোগ্য।

যেসব ভ্রান্তি ও বিচ্ছিন্ন মতের উদ্ভাবন বা পৃষ্ঠপোষকতা আলবানী সাহেব করেছেন তার কিছু দৃষ্টান্ত লক্ষ করুন–

১. তাঁর মতে, মহিলাদের জন্য স্বর্ণের আংটি ও অন্যান্য স্বর্ণবালা ব্যবহার করা হারাম অথচ মহিলাদের জন্য স্বর্ণের সব ধরনের অলংকার বৈধ, চাই তা বলয়াকৃতির হোক বা অন্য আকৃতির হোক।

২. তাঁর মতে তারাবীর নামায ৮ রাক'আত সুন্নাত আর ২০ রাক'আত বিদ'আত। অথচ উম্মতের অবিচ্ছিন্ন কর্মধারার মাধ্যমে তারাবীর নামায ২০ রাক'আত প্রমাণিত, যা ১৪০০ বছর যাবত হারামাইন শরীফাইনসহ বিশ্বের বড় বড় সব শহরে প্রচলিত আছে।

৩. তাঁর মতে, এক মজলিসে তিন তালাক দিলে এক তালাক গণ্য হবে অথচ এই মতটি সহীহ হাদীস ও ইজমা পরিপন্থী।

৪. তাঁর মতে, সুবহাহ (তাসবিহ) দ্বারা যিকির-আযকার গণনা করা বিদ'আত। অথচ এটি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। ফিকহ, ইলমে হাদীস ও অন্যান্য বিষয়ে আলবানী সাহেবের বিচ্ছিন্ন মতামতের সংখ্যা প্রচুর। কিন্তু কিছু স্থূলদৃষ্টি ব্যক্তিবর্গ ও তাঁর কিছু অন্ধ ভক্ত তাঁর এই বিচ্ছিন্ন মতামতগুলোকে মুসলিম সমাজের মধ্যে প্রচার করে ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করছে। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে সহীহ বুঝ দান করুন।

শাইখ মাহমুদ রচিত তাম্বীহুল মুসলিম গ্রন্থের ২০৫ নং পৃষ্ঠায় আলবানী সাহেবের ভুল-ভ্রান্তির ফিরিস্তি এভাবে বর্ণিত আছে :

أقول هذا بمناسبة عادة الألبانى مع مخالفيه .....

মর্মার্থ: আলবানী সাহেব তাঁর মতাদর্শের বিরোধী ব্যক্তির সঙ্গে যে আচরণ করেন সে প্রসঙ্গে কিছু বলা জরুরি মনে করছি। আলবানী সাহেব যখন কাউকে তাঁর প্রতিপক্ষ ভাবেন তখন তাঁর কথা সামনে এলে তিনি দাঁড়াবেন, বসবেন, কাঁপতে থাকবেন, ধমক দেবেন। তাঁর বই পড়তে গেলে আপনারা এ সত্যতার প্রমাণ পাবেন এবং তাঁর আক্রমণের স্বরূপ দেখবেন। তিনি প্রতিপক্ষ বিজ্ঞ আলেমদের ধ্বংসের দু'আ করেন। তাঁদের মিথ্যুক, মুশরিক, প্রতারক বলেও গালি দেন। কোনো কোনো প্রতিপক্ষকে কাফেরও বলে ফেলেন।

আবার কাউকে তিনি চক্রান্তকারী, মুনাফিক, খবিশ, গোমরাহ ইত্যাদি বলতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। তাঁর ন্যক্কারজনক কর্মকাণ্ডের শীর্ষে রয়েছে, ইমাম আহমাদ (রহ.)-কে বিদ'আতী বলে গালি দেওয়া। আলবানী সাহেব তার এই বিতর্কিত কর্মপদ্ধতি ও গর্হিত আচার-আচরণের কারণে সিরিয়ার মুসলিম জনতার আন্দোলনের মুখে

সিরিয়া থেকে বহিষ্কৃত হন। এরপর তিনি সৌদি আরবে চলে যান এবং সেখানেও এই একই কারণে আলেম-ওলামা ও জনগণের রোষানলে পড়েন। তাদের আন্দোলনের মুখে সৌদি আরব থেকেও তিনি বিতাড়িত হন। ১৯৯১ ইং সালে সরকারি নির্দেশে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে সৌদি আরবের মাটি ছাড়তে হয়। এরপর তিনি জর্ডানে আশ্রয় নেন এবং জর্ডানেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জর্ডানের সচেতন আলেমগণও তাঁর ভ্রান্ত কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। -(আল ইত্তিজাহাতুল হাদীসিয়্যাহ, মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ মুহাম্মদ)

আলবানী সাহেবের ভ্রান্তিসমূহের খণ্ডনে নির্ভরযোগ্য আলেমগণের কিছু কিতাব :

এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে আলবানী সাহেবের সব ভুলভ্রান্তি তুলে ধরা সম্ভব নয়। কারণ, তাঁর পরিমাণ এত বেশি যে এগুলোর সংকলনে বিজ্ঞ আলেমগণ হাজার হাজার পৃষ্ঠার স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে নিম্নোক্ত কিতাবগুলো পড়া যেতে পারে।

☆ الألبانى شذوذه وأخطاء ه

মুহাদ্দিস হাবীবুর রহমান আযমী।

☆ تصحيح صلاة التراويح عشرين ركعة والرد على الألبانى فى تضعيفه

শায়খ ইসমাঈল আনসারী (রহ.)

সাবেক গবেষক, দারুল ইফতা, সৌদি আরব।

☆ إباحة التحلى بالذهب المعلق للنساء والرد فى تحريمه على الألبانى

শায়খ ইসমাঈল আনসারী (রহ.)

☆ الصارم المشهور على أهل التبرج و السفور وفيه الرد على كتاب الحجاب للألبانى

শায়খ হামুদ তুযাইজারী, সৌদি আরব।

☆ النقد البناء لحديث أسماء فى كشف الوجه و الكفين للنساء

আবু মুয়াজ তারিক বিন আউযুল্লাহ, বিশেষ ছাত্র, শায়খ আলবানী।

☆ ويلك آمن

আহমাদ আব্দুল গফুর

☆ وصول التهانى بإثبات سنية السبعة و الرد على الألبانى

মাহমুদ সাঈদ মামদূহ, মিসর

☆ تنبيه المسلم إلى تعدى الألبانى على صحيح مسلم

মাহমুদ সাঈদ মামদূহ, মিসর।

☆ التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح و ضعيف

মাহমুদ সাঈদ মামদূহ, মিসর।

☆ القول المقنع فى الرد على الألبانى المبتدع

শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে সিদ্দীক আল গুমারী (রহ.)

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

নতুন শিক্ষাবর্ষের সূচনা : কিছু কথা কিছু নিবেদন

মাওলানা মুফতী জমীল আহমদ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد : رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير

সম্মানিত সুধী!

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হলো, আজ মুহিউস সুন্নাহ শাহ আবরারুল হক (রহ.) হারদুঈর স্মৃতিধন্য প্রতিষ্ঠান জামিয়াতুল আবরারের ১৪৩৬-৩৭ হি. শিক্ষাবর্ষের পাঠদান আরম্ভ হবে। কিন্তু অত্যন্ত আফসোসের বিষয় হলো, প্রতিবছর এই জামিয়ার পাঠদান শুরু করেন বংলাদেশ তথা উপমহাদেশের ক্ষণজন্মা আধ্যাত্মিক রাহবার, আকাবের দেওবন্দের মহান পুরোধা ব্যক্তিত্ব আমার শায়খ, মুরশিদ হযরতওয়ালা ফকীহুল মিল্লাত দা. বা. কিন্তু আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন, দীর্ঘদিন ধরে হুজুর কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ায় এ বছর হুজুরের পক্ষে ছবক শুরু করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। আমরা মহান রাব্বুল আলামীনের শাহী দরবারে কায়মনোবাক্যে দু'আ করছি, তিনি যেন আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় শায়খকে দ্রুত পূর্ণ সুস্থতা দান করেন। হে আল্লাহ! আমাদের জীবনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ অংশ যদি থাকে, তা হযরতওয়ালাকে দিয়ে হলেও হযরতকে সুস্থ করে দিন। আমাদের মতো শত শত লোক যদি না থাকে, তাহলে উম্মাহর কোনো উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হবে না। কিন্তু হযরতওয়ালার মতো বিশাল বটবৃক্ষের ছায়া থেকে উম্মাহর বঞ্চিত হওয়াটা তাদের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত হবে।

فاشف اللهم شيخنا ومرشدنا ومرشد علمائنا واستاذنا واستاذ مشائخنا شفاء كاملا عاجلا۔

সম্মানিত হাজিরীন!

এত বড় একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে ছবক শুরু করার মতো না আমার যোগ্যতা আছে, না হিম্মত! কিন্তু তার পরও হযরতওয়ালার রুহানী তাওয়াজ্জুহ এবং অত্র জামিয়ার নির্বাহী পরিচালক মুফতী আরশাদ রহমানী দা. বা. (খলীফা, মুহিউস সুন্নাহ হারদুঈ রহ.)-এর নির্দেশেই মূলত আমাকে এই স্থানে বসতে হয়েছে। দু'আ নেওয়ার জন্যই মূলত আপনাদের সামনে কিছু কথা আরজ করতে চাই।

প্রিয় উপস্থিতি!

আমরা সকলে সম্যক অবগত আছি যে, আজকে জামিয়াতুল আবরারে সকল বিভাগে দরস শুরু হবে। আজকে যেভাবে সুন্দর পরিবেশে ছবক শুরু হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা এভাবে সুন্দর পরিবেশে ছবক শেষ হওয়ারও তাওফীক দান করুন। আমীন!

প্রিয় সুধী!

আমাদের পাক-ভারত-বাংলাদেশের দ্বীনি মাদরাসাসমূহে চলমান সিলেবাসটি দরসে নিযামী বলে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এটি মূলত হিজরী বারতম শতকের জগৎখ্যাত আলেম মোল্লা নিযামুদ্দীন সাহালুভী (রহ.) প্রণীত একটি গুরুত্বপূর্ণ সিলেবাস। এই সিলেবাসের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এটি কোনো বিষয়ে স্থূল ও অপ্রাসঙ্গিক জ্ঞানের পরিবর্তে গভীর ইলমী রুচি ও মানসিকতা তৈরি করে। নিরন্তর অধ্যবসায়ের সাথে কেউ এই নেসাব আয়ত্ত করলে তার ইলমী যোগ্যতা হবে প্রশ্নাতীত, এতে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের সামান্যতম অবকাশও নেই। এই নেসাবে এভাবে কিতাব নির্বাচনের মানদণ্ড নির্ণয় করা হয়েছে যে, এগুলোর অধ্যয়ন দ্বারা যেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রুসুখ দিল ইলম তথা গভীর ও পরিপক্ব জ্ঞান অর্জিত হয়। এই মানদণ্ডের ভিত্তিতে সাধারণত জটিল ও সংক্ষিপ্ত ইবারত (মূল পাঠ) সম্বলিত এমন কিছু গ্রন্থ রাখা হয়েছে, যার অধ্যয়নকালে যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের পূর্ণ মনীষা ও মেধাকে ব্যয় না করবে, ততক্ষণ সে গ্রন্থ থেকে উল্লেখযোগ্য কোনো ফায়দা লাভ করতে পারবে না। এভাবে তালিবে ইলমের মাঝে জটিল ইবারত আয়ত্ত করার এবং সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর মাসআলা-মাসায়েল বোঝার এবং কঠিন বিষয়ের রহস্য উদ্‌ঘাটন করার এক অনির্বচনীয় দক্ষতা সৃষ্টি হয়ে যায়। যা ছাত্রদেরকে এ পরিমাণ যোগ্য করে দেয় যে, ভবিষ্যতে সে শিক্ষকের সহায়তা ছাড়াই নিজের পড়াশোনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপরিমেয় দক্ষতা অর্জনে সামর্থ্য হয়।

প্রিয় উপস্থিতি :

আমরা জানি, দরসে নিযামীতে যে ফন তথা বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা মূলত দুই ভাগে বিভক্ত। একটাকে علوم عالية এবং অপরটাকে علوم آلية বলা হয়। علوم عالية তথা আমাদের মূল লক্ষ্য হলো কোরআন-হাদীসের জ্ঞানার্জন করা। তবে তা অর্জন করা علوم آلية তথা নাহু, সরফ, মানতিক, বলাগাত, আদবের ইলম অর্জন করা ব্যতিরেকে অসম্ভব। তাই কোরআন-হাদীসের ইলম অর্জন করার পূর্বে আমাদেরকে আরো অনেক ফন নিয়ে পড়াশোনা করতে হয়। নাযাজের জন্য যেমন ওজু অত্যাবশ্যকীয়, তদ্রূপ কোরআন-হাদীসের সঠিক জ্ঞান অর্জন করার জন্যও এসব ইলম শেখা অপরিহার্য।

প্রিয় সুধী!

ইসলামী শরীয়তের মূল প্রাণ যেহেতু কোরআনে করীম আর হাদীসে রাসূল, তাই সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করতে প্রয়াস পাব।

কোরআনে করীম :

মুসলমানদের কাছে পবিত্র কোরআন মূল

পাঠ (টেক্সট) হিসেবেই পরিগণিত। তাই কোরআন শরীফের প্রকাশভঙ্গি অনেক বেশি সংক্ষিপ্ত। আর হাদীস শরীফ হচ্ছে সেই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। মূলত পবিত্র কোরআনে যে বিধানগুলো সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে, তাই হাদীস শরীফে বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর একটি প্রসিদ্ধ উক্তি আছে,

كل ما حكم به رسول الله ﷺ فهو مما فهمه عن القرآن

অর্থাৎ, রাসূল (সা.) যা বিধান বর্ণনা করেছেন, তা মূলত কোরআনেরই সারনির্যাস। (ইবনে কাসীর- খ. ১, পৃ. ৪)

কোরআনের বাইরের কোনো বিধান রাসূল (সা.) তাঁর পুরো জীবদ্দশায় বর্ণনা করেননি। আর এটা তাঁর জন্য সম্ভবও নয়। পবিত্র কোরআন বলছে,

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى.

তিনি মনের ইচ্ছায় কিছুই বলতে পারেন না। তিনি যা বলেন, সবই অহী। (সূরা নজম ৩-৪)

এ জন্য সম্মান এবং মাহাত্ম্যের দিক থেকে পবিত্র কোরআন আর হাদীস শরীফের মাঝখানে আকাশ-পাতালের ব্যবধান রয়েছে। পবিত্র কোরআন হচ্ছে শরীয়তের প্রথম দলিল আর হাদীস শরীফের অবস্থান হচ্ছে তার পরে। কোরআন-হাদীসের মাঝে ওই পার্থক্য রয়েছে, যা আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর মাঝে আছে, কোরআনের সম্মান বেশি না রাসূলের সম্মান?

হাকীমুল উম্মাহ আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) (১২৮০-১৩৬২) একবার ফকীহুন নাফস আল্লামা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) (মৃ. ১৩২৩ হি.) কে জিজ্ঞেস করলেন, কোরআন শরীফের সম্মান বেশি না রাসূল (সা.)-এর সম্মান বেশি? গাঙ্গুহী (রহ.) থানভী (রহ.) কে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা বলুন, রাসূল (সা.) কোরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন, না কোরআন রাসূলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে? থানভী (রহ.) বলেন, স্পষ্ট কথা হচ্ছে, রাসূল (সা.)ই পবিত্র কোরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকনে। গাঙ্গুহী (রহ.) বললেন, এখন বুঝে নিন, কার তুলনায় কে বেশি সম্মানিত? সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা যেমন কদীম, (অবিনশ্বর) তদ্রূপ তাঁর কালামও (বাণী) কদীম, (অবিনশ্বর)। আর রাসূল (সা.) যেমন حـــــــادث (নশ্বর) তদ্রূপ তাঁর কালাম ও (বাণী) হাদীস (নশ্বর)। আর হাদীসের ওপর কদীমের শ্রেষ্ঠত্ব এটা সর্বজনস্বীকৃত একটা বিষয়।

কোরআনের শ্রেষ্ঠত্বের আরেকটি প্রমাণ

রাসূল (সা.)-এর চেয়ে কোরআনে করীমের শ্রেষ্ঠত্বের আরেকটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ হলো, কোনো জুনুবীর (অপবিত্র শরীর বিশিষ্ট) জন্য কোরআন ছোঁয়ার অনুমতি নেই। পক্ষান্তরে সে রাসূল (সা.)-এর সাথে মোসাফাহা-মোআনাকা করতে পারবে। বরং হেদায়া প্রণেতার ভাষ্য মতে পবিত্র কোরআনের ওপর কাপড়ের যে কভার (জুযদান) থাকে, জুনুবী ব্যক্তির জন্য তা স্পর্শ করাও বৈধ নয়। সুবহানাল্লাহ! কালামুল্লাহর কত সম্মান!

দেখুন, কালামুল্লাহর কত সম্মান! একটি সামান্য লাকড়ি, যার প্রাণ পর্যন্ত নেই, ওই লাকড়িটা দিয়ে যখন পবিত্র কোরআন রাখার জন্য রিহাল বানানো হয় তখন ওই সাধারণ লাকড়ির দাম কত লক্ষগুণ বৃদ্ধি পায়? পবিত্র কোরআনের আয়াতসম্বলিত কোনো কাগজ যদি কেউ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে, সে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাপী হলেও ওই কাগজটাকে কত ভক্তি আর শ্রদ্ধার সাথে উঠিয়ে চুমো খেতে খেতে কোনো একটি পবিত্র জায়গায় রেখে দেয়।

এটা কিসের সম্মান? কালামুল্লাহর সম্মান!

এখন চিন্তার বিষয় হলো, কোরআনের সাথে যদি একটি জড় পদার্থেরও সম্পর্ক হয়, তাহলে তার সম্মান এভাবে বেড়ে যায়, এখন যদি কোরআনের সাথে কোনো একটি মানুষের সম্পর্ক হয়, তাহলে তার সম্মান কিভাবে বাড়তে পারে কল্পনা করে দেখুন। এ সম্পর্কে রাসূল (সা.) থেকে হযরত ওমর (রা.) একটি চমৎকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা কোরআনের মাধ্যমে অনেক জাতিকে সম্মানিত করেন আবার অনেক জাতিকে অপদস্থ করেন। (সুনানুদ্দারেমী, পৃ. ৫৩৬) কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি আমরা সম্মানিত হতে না পারি, তবে এটা আমাদের জন্য অনেক বড় দুর্ভাগ্য।

শরীয়তের দ্বিতীয় দলীল : হাদীস শরীফ

কারণ হাদীস শরীফ হলো,

اقوال الرسول وافعاله واحواله

রাসূল (সা.)-এর বাণী, কর্ম এবং অবস্থা। আর রাসূলের অবস্থান হলো সৃষ্টিজগতের সবার ওপরে। সুতরাং রাসূল (সা.)-এর বাণী তথা হাদীসের অবস্থানও হলো সবার বাণীর ওপর।

হাদীস শরীফের অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রয়েছে। যেমন, বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ শরীফ, মুয়াত্তা মালেক, মুয়াত্তা মুহাম্মদ, তহাবী শরীফ, মুসনাদে আহমদ, দারেমী, সহীহ ইবনে খুযায়মা, বায়হাকী। তবে তন্মধ্যে মুসলমানের কাছে সর্বাধিক সমাদৃত গ্রন্থ হচ্ছে, বুখারী শরীফ। বুখারী শরীফের আসল নাম হচ্ছে,

الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله ﷺ وسننه وايامه

যা বুখারী শরীফ নামেই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এর রচয়িতা হলেন আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদীস আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনুল ইসমাঈল আল বুখারী। (জন্ম, ১৩ শাওয়াল, ১৯৪হি. মৃত্যু, ১ শাওয়াল, ২৫৬ হিজরী। এই কিতাব সম্পর্কে উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হচ্ছে,

اصح الكتاب بعد كتاب الله الصحيح للبخارى

অর্থাৎ কিতাবুল্লাহর পরে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে বুখারী শরীফ।

বুখারী শরীফের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ :

বুখারী শরীফের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এ কথা দ্বারাও বোঝা যায় যে, মুহাদ্দিস বুখারী শরীফের পাঠদান করে, সবাই তাকে শায়খুল হাদীস বলে। অন্য হাদীসের পাঠদান কারীকে কিন্তু লোকেরা শায়খুল হাদীস বলে সম্বোধন করে না।

বুখারী শরীফ, আমার কিতাব :

বুখারী শরীফের শ্রেষ্ঠত্বের আরো একটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ হচ্ছে, বুখারী শরীফকে রাসূল (সা.) নিজের কিতাব বলে অবহিত করেছেন। জরহে তাদীলের অনবদ্য গ্রন্থ সিয়ারু আলামিন নুবালাতে একটি ঘটনা বিবৃত হয়েছে। বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত আবু যায়েদ মারওয়াযী (রহ.) বর্ণনা করেন,

كنت نائما بين الركن والمقام فرأيت النبى ﷺ فى المنام فقال لى يا ابازيد الى متى تدرس كتاب الشافعى؟ ولا تدرس كتابى؟ فقلت يا رسول الله وماكتابك قال جامع محمد بن اسماعيل يعنى البخارى

অর্থাৎ, আমি রুকনে ইয়ামানী ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝে শায়িত ছিলাম। এমতাবস্থায় স্বপ্নযোগে রাসূল (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। রাসূল (সা.) আমাকে সম্বোধন করে বললেন, হে আবু যায়েদ! তুমি কতকাল পর্যন্ত শাফেয়ীর কিতাবের দরসে প্রবৃত্ত থাকবে? আমার কিতাবের দরস দেবে না? আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার কিতাব কোনটি? তিনি ইরশাদ করলেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল কর্তৃক সংকলিত হাদীস গ্রন্থটিই আমার কিতাব। অর্থাৎ বুখারী শরীফ। সুবহানাল্লাহ! উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, মূলত অন্যান্য হাদীসগ্রন্থের ওপর বুখারী শরীফের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই, যে বুখারী শরীফকে রাসূল (সা.) নিজের গ্রন্থ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। হযরত হাসানাইন হযরত ফাতেমা (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব হযরত হাসান-হোসাইন (রা.) জান্নাতের যুবকদের সর্দার হওয়ার কারণ কী? হযরত ফাতেমা কেন জান্নাতের যুবতীদের সর্দারণী হবেন? কারণ তাঁদের সম্পর্ক রাসূলের সাথে। তাঁরা রাসূলের নাতি আর রাসূলের আত্মজ। তাহলে যে গ্রন্থের নিসবত তথা সম্পৃক্ততা হবে সরাসরি রাসূলের সাথে, তার কত বেশি সম্মান হবে, চিন্তা করে দেখুন!

শাহজাদার এত সম্মান কেন?

শাহজাদা তথা বাদশাহর আত্মজ এবং সাহেবজাদা তথা বুজুর্গের আত্মজ, তাঁদের এত সম্মান কেন? সবাই তাঁদের সাথে এত ভালো আচরণ করে কেন? কারণ, তাঁরা বাদশাহর ছেলে, বুজুর্গের ছেলে। তাঁদের সম্মান-মর্যাদা কেবল সম্পর্কের কারণে। আরবী ভাষায় বলা হয়, عبد السلطان حاضر তথা বাদশাহর সেবক উপস্থিত। ভাষাবিদদের ভাষ্য মতে, এই ইযাফতটা (সম্বন্ধকরণ) সম্মানের জন্য। তেমনি ইমাম বুখারীর কিতাবকে রাসূল (সা.) কর্তৃক নিজের কিতাব আখ্যা দেওয়া কত বড় গর্বের কথা! এই বিরল সৌভাগ্য পৃথিবীর অন্য কোনো গ্রন্থের ঝুলিতে নেই। হযরত হোসাইন এবং ইবনে ওমর (রা.)-এর মধ্যকার একটি ঈমানদীপ্ত ঘটনা–

একবার রাসূলের প্রিয় নাতি হযরত হোসাইন (রা.) এবং হযরত ওমরের আত্মজ হযরত ইবনে ওমর (রা.) পরামর্শ করলেন, তাঁরা জঙ্গলে গিয়ে খেজুর খাবেন। পরামর্শমতে তাঁরা জঙ্গলে গেলেন এবং ইবনে ওমর (রা.) গাছে উঠলেন। আর হযরত হোসাইন (রা.) নিচে দাঁড়িয়ে রইলেন। ইবনে ওমর (রা.) খেজুর ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিচে ফেলতে লাগলেন এবং হযরত হোসাইন তা এক জায়গায় জমা করতে লাগলেন। হঠাৎ ইবনে ওমরের দৃষ্টি নিচে পড়লে তিনি দেখতে পেলেন যে হোসাইন (রা.) খেজুরগুলো খেয়ে ফেলছেন। হযরত ইবনে ওমর (রা.) ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, আমি কষ্ট করে গাছ থেকে খেজুর ছিঁড়ছি, আর তুমি আরাম করে করে খাচ্ছো কেন? জবাবে হযরত হোসাইন (রা.) বললেন, তুমি কে? তোমার পিতা কে? এটা আমি ভালো করে জানি! তোমার পিতা আমার নানার গোলাম বৈ আর কী? এই কথা শুনে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর ধৈর্য্যের বাধ ভেঙে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ দৌড়ে গিয়ে স্বীয় পিতা ওমর (রা.)-এর কাছে হোসাইনের বিরুদ্ধে নালিশ দিলেন। যে কথা শুনে হযরত ওমর (রা.)-এর রাগান্বিত হওয়ার কথা, সে কথা শুনে হযরত ওমর (রা.) খুশিতে বাগবাগ হয়ে গেলেন, স্বীয় আত্মজকে লক্ষ করে বললেন, প্রিয় বেটা! যে কথাটি হোসাইন সাক্ষ্য দিল, সে কথাটি যদি তার নানাও স্বীকার করে নেয়, তাহলে আমার আর কী চাই? আহ! তার নানাও যদি স্বীকার করে নিতেন যে, ওমর তাঁর সামান্যতম গোলাম বৈ কিছু নয়! দেখুন! রাসূলের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কী অনির্বচনীয় আকুতি!

গুরুত্ব দিতে হবে অন্য ফনকেও :

কোরআন-হাদীস ছাড়া আরো যত বিষয় পড়ানো হয়, সেগুলোকেও যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে পড়তে হবে। ফিকহ, উসূলে ফিকহ, নাহু, সরফ, বলাগাত, মানতিক, আদব, ফালসাফা–সব বিষয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো কাচা রয়ে গেলে পূর্ণভাবে কোরআন-হাদীস বোঝা কস্মিনকালেও সম্ভবপর হবে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাঁর পছন্দনীয় পদ্ধতিতে ইলমে দ্বীন অর্জন করার তাওফিক দান করুন! আমাদের সবার প্রাণপ্রিয় মুরব্বি হযরতওয়ালা ফকীহুল মিল্লাত দা. বা. কে দ্রুত পূর্ণ সুস্থতা দান করুন। জামিয়াতুল আবরারকে আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন। এর সাহায্যকারী, হিতাকাঙ্ক্ষী, ছাত্র-শিক্ষক–সবাইকে কবুল করুন। আমীন।

গ্রন্থনা ও অনুবাদ :

মুফতী রিদওয়ানুল কাদির

বন্য প্রাণীর কোরবানী

মুফতী শরীফুল আজম

প্রিয় বস্তু উৎসর্গ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় বন্ধু হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে পূর্ণত্বের স্তরে পৌঁছানোর লক্ষ্যে কঠিন কঠিন কতেক পরীক্ষার সম্মুখীন করেছিলেন। এতে তিনি অভাবনীয় সাফল্য অর্জনে সক্ষম হন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচেছ, যখন ইবরাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষ করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করে দিলেন, (সূরা আল-বাকারা-১২৪)

এসব অগ্নিপরীক্ষার অন্যতম ছিল, প্রিয় সন্তানকে নিজ হাতে কোরবানীর জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ। তথা প্রিয় বস্তু উৎসর্গের নির্দেশ। হযরত ইবরাহীম (আ.) দীর্ঘদিন নিঃসন্তান থাকার পর অনেক কামনা-বাসনা ও দোয়া-প্রার্থনা করে আল্লাহর কাছ থেকে যে সন্তান লাভ করে ছিলেন তার কোরবানী হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য কত যে ভীষণ পরীক্ষা ছিল তার ইঙ্গিত পবিত্র কোরআনের এক স্থানে এভাবে দেওয়া হয়েছে–

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يَا بُنَىَّ إِنِّى أَرٰى فِى الْمَنَامِ أَنِّى أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى

অতঃপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলো, তখন ইবরাহীম বললেন, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে তোমাকে জবেহ করছি; এখন তোমার অভিমত কী চিন্তা করে বলো। (সূরা আস্ সাফ্ফাত-১০২)

প্রাণপ্রতিম ইসমাঈল (আ.)-কে কোরবানী করার নির্দেশ এমন সময় দেওয়া হয়েছিল, যখন পুত্র পিতার সাথে চলাফেরার যোগ্য হয়ে গিয়েছিল এবং লালন-পালনের দীর্ঘ কষ্ট সহ্য করার পর এখন সময় এসেছিল আপদে-বিপদে তাঁর পাশে দাঁড়ানোর। মূলত এ বয়সের ছেলেসন্তান পিতার সবচেয়ে প্রিয় পাত্র হয়ে থাকে। এমন প্রিয় পুত্রকে জবাই করানো আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য ছিল না বরং পুত্রবৎসল পিতার পরীক্ষা নেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। তাই তো স্বপ্নে হযরত ইবরাহীম (আ.) জবাই করে দিয়েছেন দেখেননি, বরং জবাই করছেন, অর্থাৎ জবাই করার কাজটি দেখেছেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজেকে এই কঠিন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করলেন। নিজ পুত্রকে প্রস্তুত করলেন। অতঃপর স্বপ্নের সেই দৃশ্যকে বাস্তবে পরিণত করলেন। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ঘোষণা হলো–

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا

স্বপ্নে যা দেখেছিলেন আপনি তা পূর্ণ করে দিয়েছেন। (সাফফাত ১০৫) হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন তখন আল্লাহ তা'আলা বেহেশত থেকে এর পরিপূরক নাযিল করে তা কোরবানী করার আদেশ দিলেন। এ রীতিটিই পরে ভবিষ্যতের জন্য একটি চিরন্তন রীতিতে পরিণতি লাভ করে। হাদীস শরীফে এসেছে–

قال اصحاب رسول الله ﷺ ماهذه الاضاحى يارسول الله قال سنة ابيكم ابراهيم

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল কোরবানী কী? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ.)-এর সুন্নাত। (ইবনে মাজাহ)

পশু নির্বাচন :

কোরবানীর পশু নির্বাচনে সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটি আসে তা হচ্ছে, পশুর ক্ষেত্রে শরীয়তে কোনো বাধ্যবাধকতা আছে, নাকি যেকোনো পশু দিয়ে কোরবানী করা যাবে? বিষয়টির সমাধানে আমরা হাদীস শরীফে দৃষ্টি বোলালে দেখতে পাই নবীজি (সা.) ইরশাদ করেন :

لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن (مسلم)

তোমরা প্রাপ্তবয়স্ক পশু জবাই করো। তবে তা কষ্টসাধ্য হলে ছয় মাসের ভেড়ি জবাই করো (মুসলিম শরীফ)

এতে বোঝা গেল, পশু নির্বাচনে শরীয়তের পক্ষ থেকে কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যেকোনো ধরনের পশু দিয়ে কোরবানী করা যাবে না।

তিন জাতের পশু নির্ধারণ :

কোরবানীসহ সকল প্রকার হাদঈ-র জন্য শরীয়ত কর্তৃক তিন জাতের গবাদি পশু নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রত্যেক জাতের মাঝে ওই জাতের সকল প্রকার প্রাণী ও নর-মাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিনটি জাত হচ্ছে উট, গরু ও ছাগল। এ ছাড়া অন্য কোনো পশু দ্বারা কোরবানী করা বৈধ নয়, যদিও তা হালাল প্রাণী হয়। আল্লামা কাসানী (রহ.) বলেন–

اما جنسه فهو ان يكون من الاجناس الثلاثة: الغنم او الابل او البقر ويدخل فى كل جنس نوعه الذكر والانثى منه

اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কোরবানী নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহর দেওয়া চতুষ্পদ জন্তু জবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। (সূরা হজ্জ-৩৪)

অর্থাৎ এই উম্মতকে কোরবানীর যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা কোনো নতুন আদেশ না, পূর্ববর্তী উম্মতদেরকেও কোরবানীর আদেশ দেওয়া হয়েছিল। যাতে চতুষ্পদ জন্তু জবেহ করা কালীন তারা আল্লাহর জিকির করে। এখানে চতুষ্পদ জন্তু বলে হালাল হোক বা হারাম গৃহপালিত হোক বা বন্য সকল জাতের প্রাণী উদ্দেশ্য নাকি বিশেষ বিশেষ জন্তু উদ্দেশ্য? এর উত্তর পেতে অপর দুটি আয়াতে দৃষ্টি বোলাতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ
এবং তিনি তোমাদের জন্য আট প্রকার গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আয্ যুমার-৬)

অর্থাৎ এই আট প্রকার প্রাণী মানুষের আহারের জন্য হালাল করেছেন। অপর আয়াতে এই আট প্রকার প্রাণীর বিবরণ পেশ করে বলা হয়েছে–

ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ...
وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ...

আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন (গবাদি পশুর) মোট আট জোড়া। ভেড়ার মধ্যে দুই প্রকার ও ছাগলের মধ্যে দুই প্রকার...। উটের মধ্যে দুই প্রকার এবং গরুর মধ্যে দুই প্রকার...। (সূরা আল-আনআম- ১৪৩-১৪৪)

এই চার প্রকার নর ও মাদি মিলে মোট আটটি প্রাণীর গোশত খাওয়ার জন্য এই আয়াতে হালাল করা হয়েছে।

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ
করাও বৈধ নয়। (আননূতাফ ফিল ফাতাওয়া-১৫৪)

আল্লামা বোরহানুদ্দীন মুরগানানী (রহ.) জগৎবিখ্যাত হেদায়া গ্রন্থে লিখেন–

الاضحية من الابل والبقر والغنم لانها عرفت شرعا ولم تنقل التضحية بغيرها من النبى ﷺ ولا من الصحابة رضى الله عنهم (الهداية)

কোরবানী উট, গরু এবং ছাগল দিয়ে হতে হবে। যেহেতু এই তিন জাতের কোরবানী শরীয়তে প্রমাণিত। এ ছাড়া অন্য প্রাণী দিয়ে কোরবানীর বিবরণ নবীজি (সা.) বা সাহাবায়ে কেরাম (রা.) থেকে পাওয়া যায় না। এখানে প্রমাণসহ জোড়ালোভাবে দাবি করা হলো যে ওই তিন জাতের পশু ছাড়া কোরবানী বৈধ না। শরীয়তে শুধুমাত্র ওই তিন জাতের কোরবানীর বৈধতা রয়েছে। এ ছাড়া অন্য জাতের পশুর কোরবানী নবীজি (সা.)-এর আমল বা সাহাবায়ে কেরামদের (রা.) আমল দ্বারা প্রমাণিত নয়। এমন কোনো হাদীসের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না, যাতে অন্য সব পশুর কোরবানীর বৈধতা দেওয়া হয়েছে।

কোরআন-সুন্নাহর আলোকে :

উল্লিখিত তিন জাতের পশু কোরবানীর জন্য নির্ধারণ করার বিষয়টি পবিত্র কোরআনের আয়াত ও সাহাবায়ে কেরামের আসার থেকে প্রমাণিত।

শায়খ সাঈদ সাগেরজী (রা.) বলেন–

وهى من الانعام خاصة الابل والبقر والغنم (الفقه الحنفى وادلته ٣/١٨٦)

কোরবানী শুধুমাত্র আনআমের (গবাদি পশু) মাঝে সীমিত। তথা উট, গরু এবং ছাগল। (আল ফিকহুল হানাফী -৩/১৮৬)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

والخصى والفحل، لا نطلاق اسم الجنس على ذلك والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر بدليل انه يضم ذلك الى الغنم والبقر فى باب الزكاة (بدائع ٦/٢٩٨)

কোরবানীর পশু তিন জাতের কোনো একটি হতে হবে: ছাগল, উট অথবা গরু। প্রতিটি জাতের মাঝে তার সকল প্রকার, নর-মাদি এবং ষাঁড়-খাসি অন্তর্ভুক্ত হবে, কেননা জাতি হিসেবে এ সবই এক ধরনের। ভেড়ি ছাগলজাতীয় একটি প্রাণী আর মহিষ গরুজাতীয় প্রাণী। কারণ যাকাতের ক্ষেত্রে এগুলো যথাক্রমে ছাগল ও গরুর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। (বাদায়ে-৬/২৮৯)

আল্লামা আইনি (রহ.) বলেন–

ويدخل فى البقر الجاموس لانه من جنسه كما فى الزكاة فانه يؤخذ من نصاب الجاموس ما يؤخذ من نصاب البقر (البناية ١١/٥٥)

মহিষ গরুর অন্তর্ভুক্ত হবে, কেননা তা গরুজাতীয় প্রাণী হিসেবে ধর্তব্য। যেমন যাকাতের ক্ষেত্রে ধর্তব্য হয়ে থাকে। তাই মহিষের নেসাব থেকে ওই পরিমাণ যাকাত নেওয়া হবে, যে পরিমাণ গরুর নেসাব থেকে নেওয়া হয়ে থাকে। (বেনায়া-১১/৫৫)

আল্লামা আবুল হাসান সুগদী (রা.) বলেন–

اعلم ان حكم الضحايا كحكم الهدايا ، فماجاز فى الهدايا جاز فى الضحايا وما لم يجز فى الهدايا لا يجوز فى الضحايا (النتف فى الفتاوى ١٥٤)

কোরবানীর হুকুম মূলত হাদঈ-র (হরমে জবাইয়ের জন্য প্রেরিত পশু) অনুরূপ। অতএব হাদ'ঈ-র ক্ষেত্রে যে সকল প্রাণী বৈধ কোরবানীর ক্ষেত্রে তা বৈধ আর যে সকল পশু হাদ'ঈ হিসেবে প্রেরণ বৈধ নয় তা দিয়ে কোরবানী

করলে তিনি বলেন, হাদঈর পশু হচ্ছে উট, গরু, ছাগল অথবা বড় পশুর অংশ। (বুখারী-১/২২৮/১৬৮৮)

উল্লেখ্য যে হাদঈ এবং কোরবানীর জন্তুর হুকুম এক ও অভিন্ন। যে সকল প্রাণী দ্বারা হাদঈ আদায় বৈধ নয় তা দিয়ে কোরবানীও বৈধ নয়।

وما لا يجوز فى الهدايا لا يجوز فى الضحايا لانهما نظيران (الولوالجية ٣/٧٦)

বন্য প্রাণীর কোরবানী :

কোরবানীর জন্য শরীয়তে যে তিন জাতের পশু নির্ধারণ করা হয়েছে তা অবশ্যই গৃহপালিত হতে হবে। বন্য প্রাণী দিয়ে কোরবানী শরীয়তে বৈধ নয়। অতএব বুনো গরু, বুনো মহিষ বা হরিণ ইত্যাদি চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা কোরবানী বৈধ হবে না, যদিও এর গোশত খাওয়া হালাল। এ ব্যাপারে ফকীহদের মতামত লক্ষ করুন।

ولا يجوز فى الاضاحى شئ من الوحش، لان وجوبها عرف بالشرع والشرع لم يرد بالايجاب الا فى المستأنس (بدائع ٦/٢٩٨)

কোনো ধরনের বন্য পশু দ্বারা কোরবানী বৈধ নয়। কেননা কোরবানীর বিধানটি শরীয়ত কর্তৃক প্রণীত আর শরীয়ত শুধুমাত্র গৃহপালিত জন্তু কোরবানীর বিধান দিয়েছে। (বাদায়ে-৬/২৯৮)

ولا يجوز فى الضحايا والواجبات بقر الوحش وحمر الوحش والظبى) لان الاضحية عرفت قربة بالشرع وانما ورد الشرع بها من الانعام ولان اراقة الدم من الوحشى ليس بقربة اصلا، والقربة لاتتأدى بما ليس بقربة (المبسوط للسرخسى ١٢/١٧)

কোরবানীসহ সকল ওয়াজিব আদায়ের ক্ষেত্রে বুনো গরু বুনো গাধা এবং হরিণ

بنية التضحية لم يجزئ (الموسوعة الفقهية ٥/٨٢)

আনআম ছাড়া অন্য কোনো হালাল প্রাণী দিয়ে যদি কেউ কোরবানী করে, চাই তা চতুষ্পদ হোক বা পাখিজাতীয় হোক–তার কোরবানী সহীহ হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কোরবানী নির্ধারণ করেছি। যাতে তারা আল্লাহর দেওয়া চতুষ্পদ জন্তু জবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। (সূরা হজ্জ-৩৪)

তা ছাড়া নবীজি (সা.) থেকে 'আনআম' ছাড়া অন্য প্রাণী দিয়ে কোরবানী প্রমাণিত নয়। তাই মুরগি বা মোরগ কোরবানীর নিয়্যাতে জবেহ করা বৈধ হবে না। (আল মউসু আতুল ফিকহিয়্যাহ-৫/৮২)

وحكم الاضحية ماذكر الله تعالى فى كتابه قوله : وانزلنا لكم من الانعام ثمانية ازواج (الزمر ٦) ثم فسر فقال: من الضأن اثنين (الانعام ١٤٣) الى اخر ماقال (النتف فى الفتاوى ١٥٤)

কোরবানীর বিধান যা আল্লাহ তা'আলা কোরআনে উল্লেখ করেছেন সেটা হচ্ছে, এবং তিনি তোমাদের জন্য আট প্রকার চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন (যুমার-৬)

অতঃপর এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, ভেড়ার মধ্যে দুই প্রকার (আনআম-১৪৩)

এভাবে আয়াতের শেষ পর্যন্ত। (আন্ নুতাফ ফিল ফাতাওয়া-১৫৪)

قال ابو حمزة: سألت ابن عباسؓ ---- عن الهدى فقال فيها جزور او بقرة او شاة او شرك فى دم (بخارى ١/٢٢٨ ح ١٦٨٨)

আবু হামযা (রা.) বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে হাদঈ তথা কোরবানীর জন্তুর বিষয়ে জিজ্ঞেস

অতএব সূরা হজ্জের ৩৪ নং আয়াতে بهيمة الانعام কোরবানীর যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা সকল প্রকার জন্তুর বেলায় প্রযোজ্য নয় বরং শুধুমাত্র গবাদি পশু ভেড়া, ছাগল, উট এবং গরুর মাঝে সীমাবদ্ধ। পবিত্র কোরআনে انعام 'আনআম' বলে এই চার প্রকার গবাদি পশুই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে সকল প্রকার চতুষ্পদ জন্তু উদ্দেশ্য হয় না। মূলত انعام শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আরবী অভিধানে এর অর্থ এমনই লেখা হয়েছে–

نعم : مواشى من جمال وبقر وغنم ج انعام (معجى الحى)

نعم (না'আম) : চতুষ্পদ জন্তুর মধ্য হতে উট, গরু এবং ছাগল। (মুজামিউল হাই)

الانعام : والانعام ذوات الخف والظلف وهى الابل والبقر والغنم وقيل يطلق الانعام على هذه الثلاثة (قواعدة الفقه ١٩٥)

انعام 'আনআম': মোজা এবং খুরবিশিষ্ট জন্তু। আর এগুলো হচ্ছে উট, গরু ও ছাগল। 'আনআম' শব্দটি এই তিন জাতের প্রাণীর বেলায় ব্যবহার হয়ে থাকে। (কাওয়ায়েদুল ফিকহ-১৯৫)

বিধায় ফুকাহায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হচ্ছে কোরআনে বর্ণিত انعام তথা গবাদি পশু ছাড়া কোরবানী বৈধ হবে না।

فمن ضحى بحيوان ماكول غير الانعام ، سواء اكان من الدواب او الطيور لم تصح تضحيته به لقوله تعالى ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام ولانه لم تنقل التضحية بغير الانعام عن النبى ﷺ ولوذبح دجاجة او ديكا

জবাই বৈধ নয়। কেননা কোরবানীর বিধানটি মূলত শরীয়ত কর্তৃক প্রণীত, আর শরীয়ত তা আনআম দ্বারা আদায়ের বিধান দিয়েছে। তা ছাড়া আরো একটি দলিল হচ্ছে এই যে বন্য পশুর রক্ত প্রবাহিত করা কোনো রূপ ইবাদত নয়। আর যে কাজটি ইবাদত নয় তা দিয়ে কোরবানী আদায় হবে না। (আল মাবসুত-১২/১৭)

ولا يجوز فى الاضاحى شئ من الوحشى (الهندية ٥/٢٩٨)

কোনো ধরনের বন্য প্রাণী দ্বারা কোরবানী আদায় হবে না। (হিন্দিয়্যাহ ৫/২৯৭)

ولا يجوز فى الضحايا والواجبات بقر الوحش وحمر الوحش والظباء لما روى عن الصحابة رضى الله تعالى عنهم اجمعين انهم قالوا : "الهدايا من ثلاثة من الابل والبقر والغنم" (الولوالجية ٣/٧٦)

হরিণ, বুনো গাধা এবং বুনো গরু দ্বারা কোরবানীসহ সকল প্রকার ওয়াজিব আদায় নাজায়েয। যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হাদায়া তিন জাতের পশু দ্বারা হয়ে থাকে উট, গরু ও ছাগল। (আল ওয়াল ওয়ালিজিয়া-৩/৭৬)

সকল মাযহাব একমত :

কোরবানী মূলত প্রিয় বস্তু উৎসর্গের নাম। বনের পশু কারো ব্যক্তিগত সম্পদ বা প্রিয় বস্তুর আওতায় পড়ে না। গৃহপালিত প্রাণীই মানুষের সম্পদ বা প্রিয় বস্তু হয়ে থাকে। অতএব বনের হালাল প্রাণী কোরবানী যোগ্য নয়। মাযহাব চতুষ্টয় এ ব্যাপারে একমত।

قال : اتفقوا على انه لا قربة فى ذبحها فى جزاء الصيد وكفارات الاحرام وكذلك فى الاضحية اذ لا قربة فى ذبحها (مختصر اختلاف العلماء ٣/٢٢٤)

বন্য প্রাণী জবেহ করার মাঝে কোনো সাওয়াব নেই বিধায় শিকারের জরিমানাসহ এহরামের সকল প্রকার কাফ্ফারা তদ্রূপ কোরবানী আদায়ের জন্য বন্য প্রাণী জবেহ করা পুণ্যের কাজ নয়। এ ব্যাপারে সকল মাযহাব একমত। (মুখতাছারু ইখতিলাফিল উলামা-৩/২২৪)

পোষা বন্য প্রাণীর কোরবানী :

বনের প্রাণী ঘরে বন্দি করে লালন-পালনের ফলে যদি তা একেবারে পোষ মেনে যায় এবং গৃহপালিত প্রাণীর মতো চলাফেরা করে। পালানোর প্রবণতা বা আক্রমণাত্মক আচরণ কিছুই তার মাঝে অবশিষ্ট না থাকে, যেমন অনেকে শখ করে হরিণ পুষে থাকে। তবে এ ধরনের প্রাণী দিয়েও কোরবানী জায়েয হবে না। এ ব্যাপারে ফকীহদের মতামত তুলে ধরা হলো–

وان ضحى بظبية وحشية الفت او ببقرة وحشية الفت لم يجز لانها وحشية فى الاصل والجوهر فلا يبطل حكم الاصل بعارض نادر (بدائع ٦/٢٩٩)

যদি কেউ পোষমানা বুনো হরিণ বা পোষমানা বুনো গাভি দিয়ে কোরবানী করে তবে তা জায়েয হবে না। কেননা এগুলো বংশগতভাবে বন্য প্রাণী। তাই অস্বাভাবিক দুর্লভ কোনো আচরণের ফলে এর মূল হুকুম বাতিল হবে না। (বাদায়ে-৬/২৯৯)

ولا يجوز شئ من الوحش وبقر الوحش واشباهها وان الفت (التاتارخانية ١٧/٤٣٣)

কোনো প্রকারের বন্য প্রাণী এবং বুনো গরু ইত্যাদির কোরবানী জায়েয নয়, যদিও তা পোষ মেনে যায়। (তাতারখানিয়াহ- ১৭/৪৩৩)

ولا يجوز شئ من الوحش نحو حمار الوحش وبقر الوحش واشباهها وان الفت (المحيط البرهان ٨/٤٦٨)

কোনো প্রকার বন্য প্রাণীর কোরবানী জায়েয নয়। যেমন–বন্য গাধা, বুনো গরু বা এদের মতো অন্য কোনো প্রাণী, যদিও তা পোষ মেনে যায়। (আল মুহিতুল বুরহানী-৮/৪৬৮)

সংকর জাতের বন্য প্রাণী :

গৃহপালিত প্রাণী এবং বন্য প্রাণীর সংমিশ্রণে কোনো সংকর প্রাণী জন্ম নিলে তা মাদির অনুগামী হবে। এমন সংকর জাতের প্রাণী যে প্রাণীর গর্ভে জন্মেছে তা গৃহপালিত হলে সংকর প্রাণীটিও গৃহপালিত জাতের ধর্তব্য হবে এবং এর কোরবানী জায়েয হবে। পক্ষান্তরে গর্ভধারিণী প্রাণীটি বন্য হলে তার ছানাটিও বন্য জাতের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এর কোরবানী দুরস্ত হবে না। প্রাণীর শাবক সর্বদা তার গর্ভধারিণীর হুকুমে হয়ে থাকে।

فان كان متولدا من الوحش والانسى فالعبرة بالام فان كانت اهلية يجوز والا فلا (بدائع ٦/٢٩٩)

বন্য ও গৃহপালিত প্রাণীর মিশ্রণে কোনো প্রাণী জন্ম নিলে তার মা'র দিকটি ধর্তব্য করা হবে। যদি মা গৃহপালিত হয় তবে কোরবানী জায়েয হবে, অন্যথায় নয়। (বাদায়ে-৬/২৯৯)

☆ وفى المتولد بين الوحشى والاهلى يعتبر الام (التاتار خانية ١٧/٤٣٣)

☆ وفى المتولد بين الوحشى والاهلى يعتبر الام، ان كانت الام وحشية لاتجزئ فى الاضحية وان كانت اهلية تجزئ (المحيط البرهانى ٨/٤٦٨)

☆ وان كان الولد بين وحشى واهلى فان كانت الام اهلية جازت التضحية (المبسوط للسرخسى ١٢/١٧)

গয়াল দিয়ে কোরবানী :

বিগত আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, কোনো রূপ বন্য প্রাণী দিয়ে কোরবানী জায়েয নেই। প্রাণীটি পোষ মানলেও তার হুকুম অপরিবর্তিত থাকে। সে হিসেবে গয়ালের বিধান সহজেই বুঝে নেওয়া যেতে পারে। আজকাল শখের বশে অনেকে গয়াল দিয়ে কোরবানী করে থাকে। দেশের বিভিন্ন ফার্মে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে গয়ালের লালন-পালন ও বংশবৃদ্ধির চেষ্টাও লক্ষ করা যাচ্ছে। তবে এর কোরবানী বৈধ হওয়া না হওয়ার বিষয়টি যাচাই করতে হবে সম্পূর্ণ এর বংশ ও জাতের প্রতি লক্ষ রেখে। এর বংশ বা জাত যদি মূলত বন্য প্রাণীর শ্রেণিভুক্ত হয়ে থাকে তবে ফার্মে লালন-পালন বা বংশবৃদ্ধির কারণে কোরবানীর হুকুমের মাঝে কোনো তফাত হবে না। অর্থাৎ বন্য প্রাণী হিসেবে বলতে হবে এর দ্বারা কোরবানী সহীহ হবে না।

প্রাণিবিদদের মতে গয়াল :

প্রাণিবিদদের মতে গয়াল একটি বন্য প্রাণী। এর জাতবংশের বিস্তারিত পরিচয় নিম্নে তুলে ধরা হলো–

গয়াল (বৈজ্ঞানিক নাম : Bos frontalis) বন্য গরুর একটি প্রজাতি। ভারতে এরা 'মিথুন' নামে পরিচিত। এরা 'চিটাগাং বাইসন' নামেও পরিচিত।

বাংলাদেশের ১৯৭৪ সালের বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধিত) আইনে এ প্রজাতিটি সংরক্ষিত।

নামকরণ

গয়াল বন্য গরুর একটি প্রজাতি কি না, এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। অনেকেই মনে করেন, এরা কোনো বিলুপ্ত প্রজাতির বন্য গরুর পোষা বংশধর বা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের পোষা গরু ও গৌরের সংমিশ্রণে সৃষ্ট সংকর গরু। যারা প্রজাতি হিসেবে গণ্য করেন, তাঁরা গয়ালের বৈজ্ঞানিক নাম Bos frontalis বলে উল্লেখ করেছেন।

তবে গৃহপালিত গরু, বুনো মহিষ ও বিশেষত গৌরের সাথে গয়ালের লক্ষণীয় তফাত রয়েছে। গৌরের দুই শিংয়ের মধ্যে ঢিঁবির মতো আছে, যা গয়ালের নেই। গৌরের শিং অপেক্ষাকৃত ছোট এবং ওপরের দিকে ভেতরমুখী বাঁকানো। গয়ালের শিং দুই পাশে ছড়ানো, সামান্য ভেতরমুখী বাঁকানো। শিংয়ের গোড়া অত্যন্ত মোটা। গয়াল পোষ মানলেও গৌর পোষ মানে না।

বিবরণ :

গয়াল প্রায় আমাদের গৃহপালিত প্রাণী গরুর মতোই দেখতে। এ জন্য এদের বনগরু বলা হয়। বিরাট আকৃতির এই প্রাণীটির ওজন ৪০০ থেকে ৮০০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। উচ্চতা দুই-তিন মিটার। গায়ের রং কালো। অপ্রাপ্তবয়স্ক গয়ালের রং সামান্য বাদামি। পূর্ণবয়স্ক ও মাদি গয়ালের রং সামান্য লালচে হয়ে থাকে। এদের হাঁটুর নিচ থেকে খুর পর্যন্ত সাদা লোমে আবৃত। মনে হয়, সাদা মোজা পরানো। গয়ালের মাথার ওপরের কিছু অংশ এবং কপালেও রয়েছে সাদা লোম। এদের কপালের দুই পাশে দুটি বিশাল শিং থাকে। গরুর কাঁধে সাধারণত একখণ্ড উঁচু মাংসপিণ্ড থাকে যাকে কুঁজ বলে। গয়ালের সেই মাংসপিণ্ড এত বড় যে তার অবস্থান কাঁধ থেকে পিঠের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিস্তৃত।

বুনো গয়াল দলবদ্ধভাবে বাস করে। দলের নেতৃত্বে থাকে একটি বড় ও শক্তিশালী ষাঁড়। সাধারণত, ১০-১১ মাস গর্ভধারণের পর স্ত্রী গয়াল একটি বাচ্চার জন্ম দেয়। গয়াল বাঁচে ১৫-১৬ বছর।

খাদ্যাভ্যাস

এরা তৃণভোজী। এরা সাধারণত হাতির সহবাসী। গহিন বনের যেখানে ছোট ছোট ঝোপের কচি পাতা ও ডালপালা আছে, তেমন জায়গা গয়ালের বেশ পছন্দ। শক্ত ও কর্কশ ঘাস খাওয়ায় এদের দাঁত দ্রুত ক্ষয় হয়। এই ক্ষয় পূরণে এদের ক্ষার ও লবণযুক্ত মাটি খেতে হয়। অবশ্য অন্ত্রের পোকা কমানোর জন্যও এরা লবণ খায়। গয়ালের এই অভ্যাসের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে লবণের টোপ ফেলে গয়াল ধরা হয়।

আবাসস্থল

বাংলাদেশ, ভারত, ভুটান, মিয়ানমার, মালয়েশিয়া ও চীনে গয়াল দেখতে পাওয়া যায়। চীনের ইউনান প্রদেশের দুলং ও নিজিয়াং নদীর উপত্যকা ও সংলগ্ন পাহাড়ি এলাকায় গয়াল দেখা যায়। সেখানে এরা দুলং গরু নামে পরিচিত। বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাবলাখালী, সাজেক ভ্যালি ও মিয়ানমারের সীমান্তসংলগ্ন পাহাড়ি বনে গয়ালের বিচরণ রয়েছে। বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে গয়ালের কৃত্রিম প্রজননকেন্দ্র রয়েছে।

(https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B2#cite_note-.E0.A6.95.E0.A7.87.E0.A6.AE.E0.A6.A8_.E0.A6.86.E0.A6.9B.E0.A7.87_.E0.A6.97.E0.A6.AF.E0.A6.BC.E0.A6.BE.E0.A6.B2-1)

অতএব গয়াল যে একটি বন্য প্রাণী, তা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়। তাই গয়াল দিয়ে কোরবানী বৈধ হবে না।

ইসলামী অর্থনীতি

মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-২০

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

মুদ্রার মধ্যে পরিবর্তনের তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারের ব্যাখ্যা :

افراط زر (Inflation) মুদ্রাস্ফীতি :

এ পর্যায়ে আমরা সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে মুদ্রাস্ফীতি এবং মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসকরণ এর অর্থ, প্রকার, কারণ ও এর প্রভাব বিষয়ে সারসংক্ষেপ তুলে ধরার প্রয়াস পাব। এরপর এ বিষয়ে শরীয়া দৃষ্টিকোণে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

افـــراط زر (Inflation) মুদ্রাস্ফীতির অর্থ :

মুদ্রাস্ফীতির সুনির্দিষ্ট ও বিশুদ্ধ অর্থ নির্ধারণে শুরু থেকেই অর্থনীতিবিদদের মাঝে কঠিন মতপার্থক্য পাওয়া যায়। নিউ ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরাই সর্বপ্রথম এর পরিচিতি পেশ করেন। তাঁদের মতে, افـــــــــــراط زر বা Inflation-এর অর্থ হলো "এমন অবস্থা যাতে মুদ্রার পরিমাণে অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দ্রব্যমূল্য অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়।"

বর্তমান সময়ের অর্থনীতিবিদরা মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়াকে মুদ্রাস্ফীতির একমাত্র কারণ হিসেবে দেখেন না। তবে সেটাকে বিভিন্ন কারণসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটা কারণ মনে করেন।

আবার অনেকের মতে, মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা হলো, দ্রব্যমূল্য, মজুরি ইত্যাদি স্বতন্ত্র ও ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়াকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। উক্ত সংজ্ঞায় মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার কোনো কন্ডিশন উল্লেখ নাই। (The theory of money and credit p272)

افـــراط زر (Inflation) মুদ্রাস্ফীতির (Chracteristics) বৈশিষ্ট্যতাসমূহ:

মুদ্রাস্ফীতির সর্বসম্মত তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে–

১. মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির ফলে অনিবার্যবশত (দ্রব্য ও শ্রম) মূল্য বৃদ্ধি পায়।

২. মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়া। যখন জাতীয় রাজস্ব দ্বারা সরকারের আর্থিক প্রয়োজন মেটানো অসম্ভব হয়ে যায়। তখন সরকার ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণ থেকে বিভিন্ন প্রকারের সরকারি সিকিউরিটি বা বন্ডের জামানতের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করে নিজেদের কাজ আঞ্জাম দেয়। সরকারের এ ধরনের পদক্ষেপের ফলে নামমাত্র মুদ্রার (Credit money) পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

৩. নিজের অবস্থান দৃঢ়করণে নিজেই কারণ হওয়া। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি যখন একবার শুরু হয়ে যায় তখন নিজে নিজেই তার অবস্থান দৃঢ় থেকে দৃঢ়করণের দিকে অগ্রসর হয় ফলে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা সম্ভব হয় না।

মুদ্রাস্ফীতি (Inflation)-এর প্রসিদ্ধ কয়েকটা প্রকার :

মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা ও স্বল্পতা বিবেচনায় মুদ্রাস্ফীতির অনেক প্রকার হতে পারে, যার মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটা প্রকার নিম্নে পেশ করা হলো–

(১) Creaping Inflation এ পর্যায়ের মুদ্রাস্ফীতি তার প্রভাব বিবেচনায় মুদ্রাস্ফীতির সবচেয়ে ধীরগতিসম্পন্ন প্রকার। তাই এই প্রকারের মুদ্রাস্ফীতিকে অর্থনীতির জন্য তেমন ঝুঁকিপূর্ণ মনে করা হয় না। সাধারণত বাৎসরিক ৩% হিসাবে (দ্রব্য, শ্রম) মূল্য লাগাতার বৃদ্ধি পাওয়াকে Creaping Inflation বলা হয়।

(২) Troting Inflation এই প্রকারের মুদ্রাস্ফীতি প্রথম প্রকারের তুলনায় খুব দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়ে থাকে, সাধারণত বাৎসরিক ৩% থেকে ৬% মূল্যবৃদ্ধিকে Troting Inflation বলা হয়।

(৩) Running Inflation বলা হয় বাৎসরিক ১০% মূল্যবৃদ্ধি পাওয়াকে।

(৪) Hyper Inflation এতে প্রতি মাসে ২০% থেকে ৩০% পর্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি পায়।

(৫) Stagflation যখন অর্থনীতি বাজার চড়া হওয়ার পরে অর্থনৈতিক মন্দা (Recession) এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবে অস্থির হয়ে যায়। সেটাকে Stagflation বলা হয়। এতে একদিকে উৎপাদনে স্থবিরতা নেমে আসে, অপরদিকে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেওয়ার ফলে মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই প্রকারের প্রভাব বিবেচনায় এটাকে সবচেয়ে মারাত্মক এবং ঝুঁকিপূর্ণ মুদ্রাস্ফীতি মনে করা হয়।

মুদ্রার মানে পরিবর্তন সৃষ্টিকারী উপাদানসমূহ :

সাধারণত মনে করা হয় যে, মুদ্রার মানের মধ্যে পরিবর্তনের মূল কারণ হলো, মুদ্রা তৈরিতে কমবেশি হওয়া, কিন্তু বাস্তবতা হলো মুদ্রার মানে পরিবর্তন আসার বেশ কিছু কারণ রয়েছে, যার সারসংক্ষেপ নিম্নে পেশ করা হলো–

১. মুদ্রার পরিমাণ। মুদ্রার পরিমাণ বেড়ে গেলে মূল্যের ঊর্ধ্বগতি হয় এবং মুদ্রার

মান/মূল্য হ্রাস পায়।

২. উৎপাদনের পরিমাণ। দেশে কৃষি ও শিল্প পণ্যের উৎপাদন বেড়ে গেলে মূল্য কমে যায় ফলে মুদ্রার মান বেড়ে যায়। তদুপরি দ্রব্য পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ কমে গেলে দ্রব্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং মুদ্রার মান কমে যায়।

৩. মুদ্রার বিনিময় ও হাতবদল। মুদ্রার হাতবদল ও বিনিময় বেড়ে গেলে মুদ্রার একক, পূর্বের তুলনায় পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে অধিক হারে বেড়ে যায়, ফলে মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং মুদ্রার মান কমে যায়। পক্ষান্তরে বাজারের নিম্নগতির ফলে যখন মুদ্রার লেনদেন ও হাতবদল কমে যায় তখন পণ্যের দাম কমে যায় এবং মুদ্রার মান হ্রাস পায়। কেননা ওই অবস্থায় জনসাধারণ টাকা ব্যয় করার পরিবর্তে জমা রাখাকে অধিক পছন্দ করে।

৪. জনসংখ্যা বৃদ্ধি। জনসংখ্যা ও বসতি বেড়ে গেলে এবং সেই সাথে উৎপাদন বৃদ্ধি না পেলে চাহিদা বেড়ে যাবে। ফলে দ্রব্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে এবং মুদ্রার মান কমে যাবে।

৫. চাহিদা কমবেশ হওয়া। অনেক সময় অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে দ্রব্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় যথা– যুদ্ধের ফলে। এমতাবস্থায় মুদ্রার মান কমে যায় দ্রব্যপণ্যের মূল্য বেড়ে যায় অস্বাভাবিক হারে।

৬. সরকারি বাজেট। যদি কোনো বৎসর সরকারের সম্ভাব্য আয়, ব্যয়ের তুলনায় কম হয় তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ সংগ্রহের মাধ্যমে উক্ত ঘাটতি পূরণ করা হয়। যার ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় এবং দ্রব্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়।

৭. বৈদেশিক বাণিজ্য। যদি কোনো দেশের বৈদেশিক দেনা-পাওনার ব্যালেন্স না থাকে অর্থাৎ রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি হয় তাহলে ওই দেশের মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য কমে যায়। বাহির থেকে আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য বেড়ে যায়। সাথে সাথে দেশের ভেতরে মুদ্রার মূল্যমান কমতে থাকে।

৮. ট্যাক্স। যদি সরকার আমদানীকৃত পণ্যের ওপর মোটা অংকের ট্যাক্স বসায় তখনও পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং মুদ্রার মান কমে যায়। تـفـريـط زر (Deflation) অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসকরণ, এটা মুদ্রাস্ফীতির বিপরীত অবস্থার নাম। এতে দ্রব্য, পণ্য, শ্রমের মূল্য হ্রাস পায় এবং মুদ্রার মান বৃদ্ধি পায়। মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসকরণের সম্ভাবনা ওই সময় তৈরি হয়, যখন মুদ্রার সরবরাহ কমে যাওয়ার ফলে পণ্য এবং সেবার উৎপাদনের তুলনায় মূল্য অস্বাভাবিকভাবে কমতে থাকে। (প্রাগুক্ত)

মুদ্রার মূল্য মানে পরিবর্তনের প্রভাব ও ফল :

মুদ্রার মূল্য কমে যাওয়া বা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জীবনযাপনের সর্বস্তর প্রভাবিত হয়। তবে সব ক্ষেত্রে সমান প্রভাব পড়ে না বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সুফল বয়ে আনে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কুফলও সৃষ্টি করে। নিম্নে এর সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলো–

বিভিন্ন ঋণের ওপর এর প্রভাব

মুদ্রাস্ফীতি দ্বারা প্রভাবিত শ্রেণী হলো ঋণদাতাগণ (Creditors) অর্থাৎ ওই সমস্ত লোক, যারা ঋণ দেয়। যখন মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় অর্থাৎ মূল্য বেড়ে যায় তখন ওই শ্রেণীর মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় যারা ঋণ দিয়ে রেখেছে। কেননা তারা তাদের দেওয়া ঋণ ফেরত পাবে অথচ এর মূল্য পূর্বেই হ্রাস পেয়েছে। যথা করিম রহিমকে ২০০০ ইং সালে ১ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছিল। রহিম ওই টাকা তার ঋণদাতা করিমকে ২০১৫ সালে ফেরত দিচ্ছে। ২০০০ সালে ১ লক্ষ টাকার ক্রয়ক্ষমতা নিশ্চয়ই ২০১৫ সালের ক্রয়ক্ষমতার তুলনায় বেশি ছিল। ২০০০ সালে ১ লক্ষ টাকা দিয়ে যা ক্রয় করা সম্ভব ছিল ২০১৫ সালে তা সম্ভব নয়। তাই বোঝা গেল, এর দ্বারা ঋণদাতা (Creditors) ক্ষতিগ্রস্ত হলো। পক্ষান্তরে যদি মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায় তাহলে ঋণদাতা উপকৃত হবে কেননা ওই অবস্থায় ১ লক্ষ টাকার ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের ওপর এর প্রভাব :

মুদ্রাস্ফীতির ফলে প্রভাবিত লোকদের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার হলো বিভিন্ন কল-কারখানার শ্রমিকরা। মুদ্রাস্ফীতির ফলে যখন মূল্য বেড়ে যায় এবং তাদের পারিশ্রমিক পূর্বেরটাই বহাল থাকে এর দ্বারা ওই শ্রেণীর লোক নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উল্লিখিত মাসআলাগুলো ছাড়াও মুদ্রার মূল্যমানে পরিবর্তনের আরো অনেক প্রভাব রয়েছে। যথা–কৃষক সমাজ, ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিদের ওপর এর প্রভাব। তদ্রূপ পণ্যের উৎপাদন এবং সম্পদ বণ্টনের ওপর এবং বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের ওপর এর প্রভাব।

মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে কৃষক এবং ব্যবসায়ীদের ওপর এর সুফল দেখা দেয়। কেননা তখন তাদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য বেড়ে যায় এবং তাদের আয় বৃদ্ধি পায়। তেমনিভাবে মুদ্রাস্ফীতির ফলে কৃষি ও শিল্প পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং নতুন নতুন পণ্য মার্কেটে পাওয়া যায়। সারকথা হলো, মুদ্রাস্ফীতি কৃষক, ব্যবসায়ী, শিল্প এবং উৎপাদিত পণ্যের ওপর সুফল বিস্তার করে। তদ্রূপ বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের ওপরেও মুদ্রাস্ফীতির ভালো প্রভাব পড়ে। কেননা যখন পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় তখন পুঁজিপতিরা উৎসাহী হয়ে নতুন নতুন কারখানা এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠান খুলবে জনসাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি আগ্রহী হবে, বিনিয়োগ বাড়বে, বেকারত্বের অবসান ঘটবে। পক্ষান্তরে

সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে এর খারাপ প্রভাব পড়বে। মুদ্রাস্ফীতির ফলে সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে অসমতা সৃষ্টি হয়ে যায়। সারকথা- মুদ্রাস্ফীতির ফলে ঋণদাতা, শ্রমজীবী এবং সম্পদ বণ্টনের ওপর খারাপ প্রভাব পড়ে। অপরদিকে কৃষক, ব্যবসায়ী, শিল্প পণ্যের উৎপাদন বিনিয়োগ কর্মসংস্থানের ওপর সুফল বয়ে আনে।

মুদ্রাস্ফীতি (Inflation) এবং মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করা (Deflaiton) বিষয়ক শরীয়া দৃষ্টিভঙ্গি :

আরবী ভাষায় মুদ্রাস্ফীতি বোঝানোর জন্য দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। ১. رخص ২. تضخم এবং মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়- ১. غلاء ২. انكماش তন্মধ্যে رخص এবং غلاء শব্দদ্বয় প্রাচীন। যা ফিকহের কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। তবে تضخم ও انكماش শব্দদ্বয় নতুন যা নতুন কিতাবসমূহে উল্লেখ রয়েছে। رخص শব্দের অর্থ সস্তা হওয়া অর্থাৎ মুদ্রার মূল্য কমে যাওয়া, মুদ্রা সস্তা হয়ে যাওয়া। এটাই হলো মুদ্রাস্ফীতি এবং غلاء শব্দের অর্থ- দাম বৃদ্ধি পাওয়া। অর্থাৎ মুদ্রার মূল্য বেড়ে যাওয়া। এটাই হলো মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পাওয়া। تضخم শব্দের অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া অর্থাৎ মুদ্রার পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। এটাই হলো মুদ্রাস্ফীতি এবং انكماش শব্দের অর্থ সংকোচন হওয়া অর্থাৎ মুদ্রার পরিমাণ সংকোচিত হওয়া। এটাই হলো মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পাওয়া। মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া এবং সস্তা হওয়া বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরামের দুটি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে। তন্মধ্যে একটা জমহুর উলামায়ে কেরামের, অপরটা ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর।

জমহুর উলামায়ে কেরামের মত :

মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী মাযহাব এবং ইমাম আজম ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে, মুদ্রার দাম বেড়ে যাক বা কমে যাক উভয় অবস্থায় ঋণগ্রহীতার ওপর ওই মুদ্রাই ওয়াজিব হবে, যা লেনদেনের সময় তার ওপর ওয়াজিব হয়েছিল। এর মূল্য ধর্তব্য হবে না। অর্থাৎ জমহুর ফুকাহায়ে কেরামের মতে, শরীয়তে (غلاء ও رخص) দাম বৃদ্ধি পাওয়া এবং কমে যাওয়া কোনো বিবেচ্য বিষয় নয় এবং এর দ্বারা ঋণ, কর্জ অথবা মজুরিতে কোনো প্রভাব পড়বে না। যদি আকদের সময় পয়সার মূল্য এক হাজার দিরহাম ছিল এবং পরবর্তীতে একশ দিরহাম হয়ে গেল অথবা আকদের সময় পয়সার মূল্য একশ দিরহাম ছিল এবং পরবর্তীতে ওই পয়সার মূল্য এক হাজার দিরহাম হয়ে গেছে উভয় অবস্থায় ওই পয়সাই আদায় করতে হবে, যা ঋণগ্রহীতার জিম্মায় ওয়াজিব হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে ওই পয়সার মূল্য একশ বা এক হাজার দিরহাম হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য হবে না।

শরহুযযরকানী গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে,

وان بطلت فلوس ترتبت لشخص على آخر اى قطع التعامل بها بالكلية واولى تغير ها بزيادة او نقص مع بقاء عينها فالمثل على من ترتبت فى ذمته قبل قطع التعامل بها او التغير، ولو كانت حين العقد مائة درهم، ثم صارت الفابه كما فى المدونة او عكسه لانها من المثليات (شرح الزرقانى ٥/٦٠)

অর্থাৎ যদি ওই পয়সা যা কোনো ব্যক্তির অন্য কোনো ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব ছিল। ওই পয়সার লেনদেন/প্রচলন বন্ধ হয়ে গেছে, উক্ত বিধানের মধ্যে পয়সার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া এবং কমে যাওয়ার মাধ্যমে পরিবর্তনের হুকুমও অনিবার্য অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই এমতাবস্থায় ঋণগ্রহীতার ওপর অনুরূপ আদায় করা ওয়াজিব হবে। যদিও আকদের সময় উক্ত পয়সা শত দিরহামের সমমূল্যের ছিল পরবর্তীতে হাজার দিরহাম মূল্যের হয়ে গেছে। অথবা এর বিপরীত। কেননা পয়সা অনুরূপ বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

দাসূকী গ্রন্থের টিকাতে রয়েছে–

اذا بطلت فلوس ترتبت لشخص على غيره بقرض او بيع او نكاح او كانت عنده وديعة وتصرف فيها، وكذا لو دفعها لمن يعمل بها قراضا، فالواجب المثل على من ترتبت فى ذمته، ولو كانت الفلوس حين العقد مائة بدرهم ثم صارت الفابه- (حاشية الدسوقى ٣/٤٥ بتصرف يسير)

অর্থাৎ যখন ওই পয়সা বাতিল হয়ে যায় যা কোনো ব্যক্তির অন্য কারো ওপর ওয়াজিব ছিল। ঋণ হিসেবে বা ক্রয়-বিক্রয় অথবা বৈবাহিক সূত্রে অথবা তার নিকট আমানত হিসেবে রাখা ছিল সে ওই আমানতের টাকা খরচ করেছে ওই হিসেবে তার ওপর ওয়াজিব হয়েছে। অথবা মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসার জন্য তাকে দেওয়া হয়েছিল। উপরোক্ত অবস্থাসমূহের মধ্যে ঋণগ্রহীতার জিম্মায় অনুরূপ আদায় করা জরুরি। যদিও আকদের সময় পয়সা এক দিরহামের পরিবর্তে একশ ছিল পরবর্তীতে এক হাজার হয়ে গেছে।

মানহুলজলীল গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে,

ان اقرضته دراهم فلوسا ، وهو يومئذ مائة فلس بدرهم ثم صارت مائتى فلس بدرهم فانما يرد عليك مثل ما اخذ لاغير ذلك- (منح الجليل ٢/٥٣٥)

অর্থাৎ যদি আপনি তাকে দিরহাম, পয়সার রূপে ঋণ দিয়েছিলেন এবং ওই দিনের অবস্থা এমন ছিল যে, এক দিরহাম দ্বারা একশ পয়সা পাওয়া যেত। পরবর্তীতে অবস্থার বিবর্তনে এক দিরহামের পরিবর্তে দুইশ পয়সা পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় সে আপনাকে ওই পয়সাই ফেরত দেবে, যা সে আপনার নিকট থেকে গ্রহণ করেছিল। তা ছাড়া এর ওপর আর কিছুই ওয়াজিব হবে না। আল মি'য়ার গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে,

বস্তুর দায়মুক্তি অনুরূপ দ্বারা আদায় করা ওয়াজিব। সুতরাং ব্যবহার ছেড়ে দেওয়া বা মূল্য বেড়ে যাওয়া এবং কমে যাওয়ার কোনো হিসাব করা হবে না। এটা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত ও মাযহাব।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মাযহাব

এ বিষয়ে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মাযহাব হলো মুদ্রার মূল্য বেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়া অবস্থায় মূল্য আদায় করা ওয়াজিব। হানাফী মাযহাব মতে, ফাতাওয়া এবং আমল ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর এই মতানুসারে। যদি ঋণ হয় তাহলে ঋণ গ্রহণের দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। যদি ক্রয়-বিক্রয় হয় তাহলে আকদের (চুক্তি) দিনের মূল্য হিসাব করা হবে।

এ বিষয়ে আল্লামা শামী (রহ.) বলেন–

اذا غلت الفلوس قبل القبض او رخصت، قال ابو يوسف قولى وقول ابى حنيفة فى ذلك سواء، وليس له غيرها ثم رجع ابو يوسف وقال: عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع اى فى صورة البيع ويوم وقع القرض اى فى صورة القرض، وبه علم ان فى الرخص والغلاء قولان، الاول: ليس له غيرها، والثانى : قيمتها يوم البيع وعليه الفتوى (تنبيه الرقود ٢/٥٨)

অর্থাৎ যদি কব্জ করার পূর্বেই পয়সার দাম বৃদ্ধি পায় অথবা সস্তা হয়ে যায় ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, এতে আমি এবং ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর একই মত। তাহলো পাওনাদার উক্ত পয়সাই পাবে। কিন্তু পরবর্তীতে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) পূর্বোক্ত মত থেকে ফিরে এসে বলেন, তার ওপর দিরহাম আকারে এর মূল্য আদায় করা ওয়াজিব হবে এবং উক্ত মূল্যে ক্রয়-বিক্রয়ের দিনের মূল্য বিবেচ্য হবে, যদি লেনদেন ক্রয়-বিক্রয়সংক্রান্ত অর্থাৎ অনুরূপীয় বস্তু/পণ্যের মধ্যে অনুরূপ ফেরত দেওয়া জরুরি। কেননা অনুরূপীয় বস্তু/পণ্যের মধ্যে মূল্য দ্বারা পরিবর্তন করা জায়েয নেই। এটাই পাওনাদারের পাওনার অতীব নিকটায়।

আল্লামা ইবনে কুদামা (রহ.) বলেন–

واما رخص السعر فلا يمنع سواء كان قليلا او كثيرا لانه لم يحدث فيها شئ انما تغير السعر، فاشبه الحنطة اذا رخصت او غلت۔ (المغنى لابن قدامه ٦/٤٤٢)

অর্থাৎ মূল্য হ্রাস পাওয়া এটা কোনো প্রতিবন্ধকতা নয়। মূল্য অতিরিক্ত কমে যাক বা মোটামুটি কমে যাক। কেননা এর দ্বারা নতুন কোনো কিছুই ঘটেনি কেবলমাত্র রেট পরিবর্তন হয়েছে। সেটা এমন যে, যেমনটা গমের মূল্য কমে যাওয়া বা বৃদ্ধি পাওয়া।

শরহুল মাজাল্লাহতে উল্লেখ রয়েছে যে,

استقرض من الفلوس الرائجة والعدالى اى الدرهم الغالب غشها فكسدت فعليه مثلها كاسدة ولا يغرم قيمتها وكذا كل ما يكال ويوزن لما مر انه مضمون بمثله فلا عبرة بكساد وغلاء ه ورخصه، وهذا عند ابى حنيفة (شرح المجلة للاتاسى ٢/٤٣٨)

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি প্রচলিত পয়সা অথবা আদালী (অর্থাৎ ওই সব দিরহাম যাতে খাদের ধাতব বস্তুর পরিমাণ বেশি) থেকে কর্জ নিল পরবর্তীতে ওই পয়সার ব্যবহার জনসাধারণ ছেড়ে দিল এমতাবস্থায় ঋণগ্রহীতার জিম্মায় অনুরূপ পয়সাই আদায় করা জরুরি হবে। যদি উক্ত অনুরূপের ব্যবহার জনসাধারণ ছেড়ে দেয়, তখনও ওই ব্যক্তি উক্ত পয়সার মূল্যের জিম্মাদার নয়। এই বিধানটা ওই সব বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেগুলো পাথর বা পাত্র দ্বারা পরিমাপযোগ্য। কেননা এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওই ধরনের

سئل سعيد بن لب عن رجل باع سلعة بالناقص المتقدم بالحلول فتاخر الثمن الى ان تحول الصرف وكان ذلك على جهة فبايهما يقضى له؟ وعن رجل آخر باع بالدراهم المفلسة فتاخر الثمن الى ان تبدل فبايهما يقضى له؟ فاجاب: لا يجب قبل المشترى الا ما انعقد البيع فى وقته لئلا يظلم المشترى بالزامه مالم يدخل عليه فى عقده (المعيار المعرب ٦/٤٦٢)

উপর্যুক্ত বক্তব্যের সারসংক্ষেপও ওই, যা অন্যান্য বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মুদ্রার মূল্যে পরিবর্তন হলে উক্ত মুদ্রাই আদায় করা ওয়াজিব হবে এর মূল্য আদায় করা ওয়াজিব নয়।

আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) বলেন,

ان باع برطل فلوسا فهذا ليس له الا رطل زاد سعره ام نقص۔۔۔ فان باع بالف فلوسا او فضة او ذهبا ثم يتغير السعر فظاهر عبارة الروضة المذكورة ان ليس له الا ما يسمى الفا عند البيع ولا عبرة بماطراء (الحاوى للفتاوى ١/٩٧)

অর্থাৎ এক রিতিলের (মাপের একক বিশেষ) বিনিময়ে পয়সা বিক্রি করল তাহলে সে এক রিতিলই পাবে এর মূল্য বেড়ে যাক বা কমে যাক। সুতরাং এক হাজারের বিনিময়ে যদি কোনো ব্যক্তি পয়সা, স্বর্ণ, রৌপ্য বিক্রি করল এবং পরবর্তীতে মূল্যের মধ্যে পরিবর্তন এলো, এমতাবস্থায় আর রাওজা গ্রন্থের বক্তব্য দ্বারা বোঝা যায় যে, সেই বিক্রেতা ওইটাই পাবে, যাকে বিক্রি করার সময় হাজার বলা হতো। পরবর্তীতে পরিবর্তন যা এসেছে তা ধর্তব্য হবে না।

আল্লামা ইবনে হাজর (রহ.) বলেন–

ويردوجوبا حيث لا استبدال المثل فى المثلى لانه اقرب الى حقه۔ (تحفة المحتاج ٥/٤٤)

হয়ে থাকে। যদি লেনদেন ঋণসংক্রান্ত হয় তাহলে ঋণ গ্রহণের দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা বোঝা গেল মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া এবং কমে যাওয়া বিষয়ে দুটি মত। প্রথম মতানুসারে অনুরূপ আদায় করা ওয়াজিব। দ্বিতীয় মতানুসারে ক্রয়-বিক্রয় দিনের মূল্য ওয়াজিব এবং এর ওপরই ফাতাওয়া।

আল্লামা ইবনে আবেদীন (রহ.) বলেন–

اذا غلت قيمة الفلوس او انتقصت ، فالبيع على حاله ولا يتخير المشترى، ويطالب بالنقد بذلك العيار الذى كان وقت البيع ، كذا فى فتح القدير، وفى البزازية عن الملتقى: غلت الفلوس او رخصت فعند الامام الاول والثانى اولا : ليس عليه غيرها، وقال الثانى ثانيا: عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض وعليه الفتوى، وهكذا فى الذخيرة والخلاصة بالعزو الى المنتقى، وقد نقله شيخنا فى بحره وقره فحيث صرح بان الفتوى عليه فى كثير من المعتبرات فيجب ان يعول عليه افتاء وقضاء الخ (تنبيه الرقود ٢/٦٠)

অর্থাৎ যখন পয়সার মূল্য বেড়ে যাবে অথবা কমে যাবে তখন ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি আপন অবস্থায় বহাল থাকবে। ক্রেতার জন্য চুক্তি ভঙ্গ করার এখতিয়ারও থাকবে না। ক্রেতা থেকে ওই মুদ্রাই চাওয়া হবে, যা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ছিল। ফতহুল কাদীর গ্রন্থেও এভাবে উল্লেখ রয়েছে। ফাতাওয়া বয্যাযিয়াতে আল-মুনতাকা গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা হয়েছে যে, পয়সার মূল্য বৃদ্ধি পাক বা কমে যাক তখন প্রথম ইমাম এবং দ্বিতীয় ইমামের মতে প্রথমে এই মাসআলা ছিল যে ক্রেতার ওপর পরিবর্তিত মুদ্রা ছাড়া আর কিছুই ওয়াজিব হবে না এবং দ্বিতীয় ইমাম অর্থাৎ ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) পরবর্তীতে বলেন, তার ওপর দিরহাম আকারে এর মূল্য ওয়াজিব হবে। এর ওপরই ফাতাওয়া। তদ্রূপ যখীরা এবং খোলাসা গ্রন্থে মুনতাকা গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ রয়েছে। এটাকেই আমাদের শায়েখ স্বরচিত গ্রন্থ বাহারের মধ্যে উল্লেখ করেছেন এবং পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, অনেক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে এর ওপর ফাতাওয়া হবে তা উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং ফাতাওয়া এবং বিচার উভয় ক্ষেত্রে এর ওপর নির্ভর করা চায়।

আল উকুদুদ্দুরিয়্যাতে উল্লেখ রয়েছে,

وان رخصت او غلت فقيل: ليس للبائع غيرها، اى يجب على المشترى رد المثل، وقيل : تجب قيمتها يوم البيع او يوم القبض فى صورة القرض، وعليه الفتوى (العقود الدرية ٢٨٠)

অর্থাৎ যদি পয়সার মূল্য কমে যায় বা বৃদ্ধি পায় তাহলে এ বিষয়ে একটা মত হলো বিক্রেতা ওই পয়সাই পাবে, যার ওপর আকদ (চুক্তি) হয়েছে। অর্থাৎ ক্রেতার ওপর অনুরূপ আদায় করা ওয়াজিব। দ্বিতীয় মতানুসারে ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে বিক্রয়ের দিনের এবং ঋণের মধ্যে ঋণ গ্রহণের দিনের মূল্য আদায় করা ওয়াজিব হবে। এই মতটার ওপরই ফাতাওয়া।

আল্লামা ইবনে আবেদীন (রহ.) আল্লামা গাজ্জী (রহ.)-এর দৃঢ়তা বর্ণনা করেছেন যে, এ বিষয়ে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতের ওপরই ফাতাওয়া। তিনি বলেন–

وقد تتبعت كثيرا من المعتبرات من كتب مشائخنا المعتمدة فلم ار من جعل الفتوى على قول ابى حنيفة رضى الله عنه، بل قالوا: به كان يفتى القاضى الامام، واما قول ابى يوسف فقد جعلوا الفتوى عليه فى كثير من المعتبرات فليكن المعول عليه- (تنبيه الرقود ٢/٦٥)

অর্থাৎ আমি (আল্লামা গাজ্জী) আমার শায়খদের অনেক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছি আমি কাউকে দেখি নাই যে, তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতের ওপর ফাতাওয়া দিয়েছেন। তবে তাঁর মতানুসারে কাজী ইমাম (রহ.) ফাতাওয়া দিতেন। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতের সম্পর্ক যতটুকু রয়েছে ওই মতানুসারে অনেক নির্ভরযোগ্য কিতাবে ফাতাওয়া দেওয়া হয়েছে। তাই এর ওপরই নির্ভর করা চাই।

জ্ঞাতব্য :

মনে রাখা চাই যে, মুদ্রার ব্যবহার ছেড়ে দেওয়া, দাম বৃদ্ধি পাওয়া এবং কমে যাওয়া ইত্যাদি পরিবর্তনের ব্যাপারে উল্লেখ্য বিধিবিধান এবং ব্যাখ্যার সম্পর্ক প্রকৃতিগত ছমনের সাথে নয় বরং কেবলমাত্র প্রথাগত ছমনের সাথে। কেননা প্রকৃতিগত ছমন যথা-স্বর্ণ-রৌপ্যের ছমন হওয়ার যোগ্যতা কখনো বাতিল হয় না। সুতরাং এতে ব্যবহার ছেড়ে দেওয়ার কল্পনাও করা যায় না। তদ্রূপ দাম বৃদ্ধি পাওয়া এবং কমে যাওয়ার দ্বারা এতে উল্লেখযোগ্য এমন কোনো পরিবর্তন আসে না, যার ফলে আকদকারীদ্বয়ের মধ্যে কারো কোনো ক্ষতি হয়। স্বর্ণ-রৌপ্যের মধ্যে অনুরূপ আদায় করাই জরুরি। কারো নিকটও মূল্যের হিসাব বিবেচ্য নয়। পক্ষান্তরে প্রথাগত ছমন। এতে এর ব্যবহার ছেড়ে দেওয়া ও প্রভাব বিস্তার করে, যার কারণ একেবারেই স্পষ্ট। তদ্রূপ মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া এবং কমে যাওয়ার ফলেও এতে বড় ধরনের পরিবর্তন এসে যেতে পারে। যদ্দারা আকদকারী পক্ষদ্বয়ের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই আকদকারী পক্ষদ্বয়কে ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর উপরোক্ত মত এখতিয়ার করা হয়েছে। হানাফি মাযহাবের অনুসারীগণ উক্ত মতের ওপর

ফাতাওয়া দিয়ে থাকেন। কেননা এই মতটা শরীয়তের চাহিদার অতীব নিকটীয় এবং পাওনাদারের হকের সংরক্ষণ ও ক্ষতি থেকে বাঁচানো হয়।

হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা :

এখানে এ কথাটা বোঝা অত্যন্ত জরুরি যে মুদ্রার দাম বৃদ্ধি পাওয়া এবং কমে যাওয়ার ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাব মতে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতের ওপর ফাতাওয়া। পয়সার দাম বৃদ্ধি পাক অথবা সস্তা হয়ে যাক উভয় অবস্থায় তাঁর মতে অনুরূপ আদায় করা জরুরি নয় বরং মূল্য আদায় করা জরুরি। এ কথাটার মর্মার্থ হলো, তিনি পয়সার মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি এবং মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস উভয়টার বিবেচনা করেছেন। তাই প্রশ্ন হলো বর্তমান ব্যাংক নোটের মধ্যেও কি মুদ্রাস্ফীতি এবং মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস বিবেচ্য হবে? এবং উভয় অবস্থায় মূল্য ধর্তব্য হবে? নাকি অনুরূপ আদায় করতে হবে? যদি এর উত্তর হ্যাঁসূচক হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে ঋণ দিয়েছিল অথবা ওই ব্যক্তির জিম্মায় তার ঋণ ছিল পরবর্তীতে মুদ্রাস্ফীতির কারণে ব্যাংক নোটের মূল্য হ্রাস পায় যেমনটা অধিকাংশ সময় হয়ে থাকে। ফলে পাওনাদারকে কিছু অতিরিক্ত দিয়ে দেবে। যাতে মুদ্রাস্ফীতির ফলে যা কম হয়েছিল তা পূরণ হয়ে যায়। যেমনটা সুদকে বৈধতা দানকারীরা বলে থাকে। এটা তাদের একটা দলিলও বটে। এভাবে সুদের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে। উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর যদি না-সূচক হয় তাহলে পয়সা এবং ব্যাংক নোটের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করা জরুরি হবে। উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর না-সূচক। পয়সা এবং বর্তমান ব্যাংক নোটের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ব্যাংক নোট পয়সার মতো নয়, তাই পয়সার মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতের ওপর ফাতাওয়া দেওয়ার দ্বারা বর্তমান ব্যাংক নোটের ওপরও একই ফাতাওয়া দেওয়া জরুরি নয়। কেননা ওই কালে পয়সা স্বর্ণ-রৌপ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের ওপর ভিত্তি করেই পয়সার মূল্য নির্ধারণ করা হতো এবং পয়সা স্বর্ণ-রৌপ্যের জন্য খুচরা পয়সা হিসেবে ব্যবহার হতো। যথা–১০ পয়সা সমান এক দিরহাম অর্থাৎ এক পয়সা এক দিরহামের দশ ভাগের এক ভাগ হয়ে গেল। কিন্তু এক পয়সার উক্ত মূল্য তার নিজস্ব মূল্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হতো না বরং সেইটা এমন একটা সাংকেতিক মূল্য ছিল, যাকে জনসাধারণ পরিভাষা বানিয়ে নিয়েছিল। তাই উক্ত পরিভাষা পরিবর্তনযোগ্য ছিল। ফলে যদি বিশ পয়সা সমান এক দিরহাম হয় তাহলে এক পয়সা এক দিরহামের বিশ ভাগের এক ভাগ হবে। এর অর্থ হলো, পয়সা সস্তা হয়ে গেল এবং পয়সার মূল্যমান কমে গেল। এমন সম্ভাবনাও ছিল যে জনসাধারণ এমন এক পরিভাষা নির্ধারণ করত যে, পাঁচ পয়সা সমান এক দিরহাম হয়ে গেল। অর্থাৎ এক পয়সা এক দিরহামের পাঁচ ভাগের এক ভাগ হয়ে গেল। এর অর্থ হলো পয়সার মূল্য বৃদ্ধি পেল। উপর্যুক্ত নীতিমালা অনুসারে যদি পয়সার মূল্যের মধ্যে উত্থান-পতন হয় তাহলে কি ঋণগ্রহীতার ওপর ওই পুরাতন মুদ্রা ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হবে, নাকি এর মূল্য ধর্তব্য হবে? এ বিষয়ে উপরোক্ত মতবিরোধ হয়ে গেছে এবং হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতের ওপর ফাতাওয়া দিয়ে থাকেন। তাই তাদের মতে যদি কোনো ব্যক্তি একশ পয়সা ঋণ নিয়েছিল পরবর্তীতে এক পয়সা এক দিরহামের বিশ ভাগের এক ভাগ হয়ে গেল। এখন সে দুইশ পয়সা আদায় করবে। কেননা সে বাস্তবে দশ দিরহামের খুচরা পয়সা কর্জ নিয়েছিল এবং বর্তমানে আদায় করার সময় দশ দিরহামের খুচরা পয়সা দুইশ পয়সা হয়ে গেছে। তাই ঋণগ্রহীতার ওপর দুইশ পয়সা আদায় করা ওয়াজিব হয়ে গেছে। কিন্তু যতটুকু বর্তমান ব্যাংক নোটের সম্পর্ক ওইগুলোর সাথে অন্য কোনো ছমনের সাথে কোনো প্রকারের সম্পর্ক ও সংশ্লিষ্টতা নেই। এই নোটগুলো অন্য কোনো ছমনের খুচরা অংশ হিসেবেও ব্যবহার হয় না। বরং ওই নোটগুলো স্বতন্ত্র ছমন। তাই ব্যাংক নোটগুলোকে পয়সার ওপর কিয়াস (তুলনা) করা ঠিক হবে না। তা ছাড়া পয়সার সঠিক মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব ছিল। কেননা ওই পয়সাগুলো স্বর্ণ বা রৌপ্যের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের সাথে সম্পৃক্ত ছিল অথচ ব্যাংক নোটগুলোর বাস্তব কোনো মাপ-পরিমাপ নাই। বরং এতে পণ্যের মূল্য দেখে অনুমান হিসেবে কাজ করা হয়। শরীয়তে যার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।

সারকথা, ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতের সম্পর্ক তৎকালীন যুগের পয়সার সাথে। ওই পয়সা এবং ব্যাংক নোটের মধ্যে রয়েছে পার্থক্য। তাই উপরোক্ত বিধানের ক্ষেত্রে ব্যাংক নোট পয়সার মতো হবে না। ব্যাংক নোটের মধ্যে মূল্য বিবেচ্য হবে না বরং অনুরূপতা বিবেচ্য হবে। যেমনটা জমহুর ফুকাহায়ে কেরামের মত। তাই ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতকে ভিত্তি বানিয়ে ব্যাংক নোটের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতির ফলে আধিক্যকে বৈধ বলা জায়েয হবে না। (আহকামুল আওরাকিন্নকদিয়্যাহ, পৃ. ৪২)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার-১৬

মুফতী ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী

আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর অনুসরণ করো :

ডা. জাকির নায়েক বলেছেন-

The Qur'an further says, "Obey Allah, and obey the Messenger" [Al-Qur'an 4:59]

All the Muslims should follow the Qur'an and authentic Ahadith and ensure that they are not divided among themselves

পবিত্র কোরআনের ঘোষণা–

'তোমরা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর অনুসরণ করো। প্রত্যেক মুসলমানের কোরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করা উচিত। এবং এটি নিশ্চিত করা উচিত যে তারা নিজেদের মধ্যে বিভক্ত নয়।'

(http://www.irf.net/index.php?option=com_content&view=article&id=459%3Awhich-school-of-thought-should-a-muslim-follow&catid=76%3Aqueries-on-islam-may-2011&Itemid=199)

এখানে ডা. জাকির নায়েক আয়াতের শেষ অংশ এড়িয়ে গেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর অনুসরণের পাশাপাশি গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী আলেমদের অনুসরণের কথা বলা হয়েছে।

ডা. জাকির নায়েক আরও বলেছেন–

A true Muslim should only follow the Glorious Qur'an and the Sahih Hadith.

'একজন সত্যিকারের মুসলমান শুধু (only) কোরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসরণ করবে।'

(http://www.irf.net/index.php?option=com_content&view=article&id=459%3Awhich-school-of-thought-should-a-muslim-follow&catid=76%3Aqueries-on-islam-may-2011&Itemid=199)

সম্পূর্ণ আয়াত ও তার ব্যাখ্যা নিচে প্রদান করা হলো,

আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নির্দেশ মান্য করো, মান্য করো রাসূলের নির্দেশ এবং তোমাদের মধ্যে যাঁরা গভীর জ্ঞানের অধিকারী (আলেম বা বিচারক) রয়েছেন তাঁদের। তারপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়ো, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ করো; যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো। আর এটাই কল্যাণকর আর পরিণতির দিক থেকে উত্তম।'

এ আয়াতে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের অনুসরণের পাশাপাশি উলুল আমরের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। সর্বাগ্রে বিবেচ্য বিষয় হলো, এখানে উলুল আমর দ্বারা উদ্দেশ্য কী? এ সম্পর্কে মুফাসসিরগণ যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন, তার সারসংক্ষেপ হলো,

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও হযরত জাবের (রা.) বলেন,

هم الفقهاء والعلماء الذين يعلِّمون الناس معالِمَ دينهم

এখানে 'উলুল আমর' হলো, ফকীহ ও আলেমগণ; যাঁরা মানুষকে তাদের দ্বীনি বিষয় শিক্ষা দান করেন।

একই মত দিয়েছেন তাবেয়ী হাসান বসরী (রহ.), মুজাহিদ, জাহ্হাক প্রমুখ মুফাসসিরগণ। তাঁদের বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে তাঁরা সূরা নিসার ৮৩ নং আয়াত উল্লেখ করেছেন,

ولو رَدُّوْه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لَعَلِمَهُ الذين يَسْتَنبِطُونهُ منهم

'যদি তারা আল্লাহর রাসূল এবং উলুল আমরের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করত, তাহলে তাদের মধ্যে যারা গবেষণার যোগ্য, তারা তা গবেষণা করে নিরূপণ করতে সক্ষম হতো।'

২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, উলুল আমর হলো, আমীর ও শাসকগণ। বিভিন্ন হাদীসে আমীর ও শাসকদের অনুসরণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। তবে শর্ত হলো, তাদের আদেশ শরীয়তের বৈধ সীমার মধ্যে থাকতে হবে। এখন তারা যদি কোনো অবৈধ বিষয়ে কোনো আদেশ করে, তাহলে তাদের সে আদেশ মান্য করা বৈধ নয়।

[তাফসীরে তবারী, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৫০, মা'আলিমুত তানজীল, আল্লামা বাগাবী (রহ.), খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৯, তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩২৬]

৩. সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) লিখেছেন–

وأبو العالية وعطاء بن أبى رباح والضحاك ومجاهد فى إحدى الروايتين عنه " :أولو الأمر هم العلماء "وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وقال أبو هريرة وابن عباس فى الرواية الأخرى وزيد بن أسلم والسدى

ومقاتل" :هم الأمراء "وهو الرواية الثانية عن أحمد.

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁর এক বর্ণনায়,

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ, হযরত হাসান বসরী (রহ.), আবুল আলিয়া, হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহ.), যাহ্হাক (রহ.) এবং মুজাহিদ (রহ.)-এর এক বর্ণনায়, উলুল আমর হলো, আলেমগণ। এটি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর একটি মত। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ইবনে আববাস (রা.) অপর এক বর্ণনায়, যায়েদ ইবনে আসলাম, সুদ্দী, মুকাতেল (রহ.) প্রমুখ মুহাদ্দিসীনদের অভিমত হলো, উলুল আমর হলো, আমীর ও শাসকগণ। এটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের অপর এক অভিমত।

[ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১০]

এ আয়াতটি সংক্ষিপ্ত হলেও এর তাৎপর্য ব্যাপক। এ আয়াতকে অবলম্বন করে একশ্রেণীর মানুষ 'ইজমা' অস্বীকার করে। অথচ এটি শরীয়তের একটি অকাট্য প্রমাণ। আরেক শ্রেণী এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণ পেশ করে কিয়াস অস্বীকার করে। সুতরাং আয়াতটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা জরুরি।

আমরা সকলেই অবগত যে, ইসলামী শরীয়তের বিধিবিধানের জন্য চারটি দলিল বা প্রমাণ রয়েছে। যথা :

১. কোরআন
২. সুন্নাহ
৩. ইজমা
৪. কিয়াস

অনেকেই এ আয়াতের সঠিক তাৎপর্য না বোঝার কারণে মনে করেন, শেষোক্ত দুটি বিষয় এ আয়াতের বক্তব্য দ্বারা অসার প্রমাণিত হয়। কেননা এখানে মূলত আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। এবং কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য ও মতানৈক্য দেখা দিলে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দিকে বিষয়টি প্রত্যর্পণের আদেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ দুটি বিষয় ব্যতীত অন্য কোনো বিষয় যেমন ইজমা ও কিয়াস মানার আবশ্যকতা বা সুযোগ কোথায়?

কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হলো, এ আয়াতে মূলত আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত চারটি বিষয়ই অনুসরণ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। জগৎদ্বিখ্যাত ওলী, দার্শনিক ও মুফাসসির আল্লামা ফখরুদ্দিন রাযী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে কাবীরে' (তাফসীরে রাযী) এ আয়াতের যে তাফসীর করেছেন, সে আলোকে নিম্নে আলোচনা করা হলো–

আয়াতের প্রথম অংশে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ করো। এখানে কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ কি আল্লাহর অনুসরণ নয়? তবে পৃথকভাবে এখানে আল্লাহর অনুসরণ করার কথা বলার বিশেষ তাৎপর্য কী? এখানে পৃথকভাবে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের অনুসরণের কথা বলার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কোরআন ও সুন্নাহ উভয়টি শরীয়তের অকাট্য প্রমাণ, এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা। আল্লামা ফখরুদ্দিন রাযী তাফসীরে রাযী (তাফসীরে কাবীর) এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন,

الفائدة فى ذلك بيان الدلالتين ، فالكتاب يدل على أمر الله ، ثم نعلم منه أمر الرسول لا محالة ، والسنة تدل على أمر الرسول ، ثم نعلم منه أمر الله لا محالة ، فثبت بما ذكرنا أن قوله : (أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) يدل على وجوب متابعة الكتاب والسنة.

এখানে দুটি বিষয় পৃথকভাবে উল্লেখ করার বিশেষ তাৎপর্য হলো, দুটি বিষয়ের প্রত্যেকটি যে একটি অপরটির জন্য প্রমাণ, সেটি উল্লেখ করা। সুতরাং কিতাবুল্লাহ বা কোরআন আল্লাহর আদেশের জন্য প্রমাণ এবং কোরআন থেকে রাসূল (সা.)-এর অনুসরণের আবশ্যকতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আবার সুন্নাহ আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর অনুসরণের জন্য প্রমাণ। আর সুন্নাহ থেকে আল্লাহর অনুসরণের বিষয়টি আমরা জানতে পারি। সুতরাং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ করো, এ আদেশ কিতাব ও সুন্নাহ উভয়টি অনুসরণের আবশ্যকতা প্রমাণ করে।

[তাফসীরে রাযী, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-১০৭]

আয়াতের পরবর্তী অংশ হলো, তোমরা উলুল আমরের অনুসরণ করো।

এ অংশটি 'ইজমার' জন্য দলিল। কারণ আল্লাহ তা'আলা এখানে 'সুদৃঢ়ভাবে উলুল আমরের অনুসরণের কথা বলেছেন। আর যে বিষয়টির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা অকাট্যভাবে পালনের নির্দেশ প্রদান করেন তা অবশ্যই সব ধরনের ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে হতে হবে। কেননা কোনো বিষয়ে যদি ভুল-ত্রুটি স্বীকার করে নেওয়া হয়, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে ভুল-ত্রুটি অনুসরণের আদেশ অসম্ভব। কেননা গোনাহ বা ভুলের অনুসরণ শরীয়তে নিষিদ্ধ। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যেহেতু এখানে অকাট্যভাবে উলুল আমরের অনুসরণের নির্দেশ প্রদান করেছেন, সুতরাং এটিই প্রমাণ করে, উলুল আমরের অনুসরণের বিষয়টি অবশ্যই ভুল-ত্রুটিমুক্ত হতে হবে।

এখন বিবেচনার বিষয় হলো, উলুল আমর কি সামগ্রিকভাবে সমস্ত মুসলিম উম্মাহর, নাকি পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক মুসলিম বা তাদের কিছু অংশ। স্পষ্টত উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি এখানে উদ্দেশ্য নয়। কেননা তাদের প্রত্যেকের সঠিক অবস্থানে থাকা এবং সে সম্পর্কে আমাদের অবগত হওয়ার বিষয়টি অসম্ভব।

অতএব, উম্মতের সেই অংশটিই উদ্দেশ্য হবে, যারা শরীয়তের বিষয়ে সুগভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করে শরীয়তের বিভিন্ন

বিষয়ে সমাধান দিতে সক্ষম (আহলুল হল্লি ওয়াল আক্‌দ) এবং তাদের ঐকমত্য হওয়াটা প্রমাণ করে যে, বিষয়টি সঠিক। আর এভাবে শরীয়তের বিষয়ে সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী আলেম ও ফকীহদের ইজমা শরীয়তের অকাট্য প্রমাণ।

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, মুফাসসিরগণ এ আয়াতে ইসলামী শাসক ও আমীরদেরকে উদ্দেশ্য নিয়েছেন। ইবনে আব্বাস (রা.)সহ প্রমুখ মুফাসসিরগণ উলুল আমর দ্বারা আলেম ও ফকীহদের উদ্দেশ্য নিয়েছেন। সুতরাং এখানে তাঁরা তাঁদের ইজমার বিষয়টি উল্লেখ করেননি।

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, উপর্যুক্ত তাফসীরের সাথে ইজমার কোনো বৈপরীত্য নেই। তাদের এ বক্তব্য ইজমার বিষয়টিকে আরও শক্তিশালী করে। কেননা উলুল আমর দ্বারা যদি ইসলামী আমীর, কাযী, শাসক বা খলিফা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে দেখতে হবে তারা কোরআন ও হাদীস থেকে সমাধান দেওয়ার যোগ্য কি না। যদি যোগ্য হন, যেমন খোলাফায়ে রাশেদীন, তবে হয়তো তাঁরা একে অপরের সাথে ঐকমত্য পোষণ করবেন, না হয় ভিন্নমত পোষণ করবেন। যদি তাঁরা একে অপরের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন, তবে তা-ই ইজমা হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং ইসলামী শাসকগণ যাঁরা কোরআন ও হাদীসের বিষয়ে সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী, তাঁদের কোনো বিষয়ে একমত হওয়াটা ইজমার অন্তর্ভুক্ত। আর যদি তাঁরা একমত না হন, তাহলে তার বিধান আয়াতের শেষাংশে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার শাসক যদি ইসলামী বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও ইজতেহাদের যোগ্যতা না রাখেন যেমন, পরবর্তী যুগের অধিকাংশ শাসক, তবে তারা সে সমস্ত ফকীহের ওপর নির্ভরশীল হবেন, যাঁরা ইজতেহাদের যোগ্যতা রাখেন। অতএব, উলুল আমর দ্বারা মুসলিম উম্মাহের উলামায়ে কেরামের ইজমা উদ্দেশ্য হবে। আর কিভাবে ওই সমস্ত শাসক উদ্দেশ্য হবে, যারা দ্বীনের বিষয়ে ন্যূনতম কোনো জ্ঞান রাখে না। সুতরাং ফকীহ ও আলেমদের ঐকমত্য এখানে উদ্দেশ্য হবে, কেননা তাদের ভিন্ন ভিন্ন মতের বিধানটি আয়াতের শেষাংশেই বলা হয়েছে।

আল্লামা ফখরুদ্দিন রাযী (রহ.) বলেছেন, অধিকাংশ শাসক ধর্মীয় বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী নয় এবং তারা অনেক ক্ষেত্রে ফাসেক- ফাজের হয়ে থাকে। এ জন্য এ আয়াতে উলুল আমর দ্বারা শরীয়তের বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী আলেমগণ উদ্দেশ্য হবে। তিনি লিখেছেন,

فكان حمل الآية على الاجماع أولى ، لأنه أدخل الرسول وأولى الأمر في لفظ واحد وهو قوله :(أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الامْرِ) فكان حمل أولى الأمر الذى هو مقرون بالرسول على المعصوم أولى من حمله على الفاجر الفاسق

'রাসূলের অনুসরণের নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু উলুল আমরের অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সুতরাং উলুল আমর দ্বারা এখানে উম্মতের ইজমা উদ্দেশ্য নেওয়া উত্তম। কেননা অধিকাংশ শাসক (বর্তমানে) ফাসেক-ফাজের হয়ে থাকে।

ধর্মীয় বিষয়ে শাসকদের জ্ঞানের স্বল্পতার কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,

أن أعمال الأمراء والسلاطين موقوفة على فتاوى العلماء ، والعلماء في الحقيقة أمراء الأمراء ، فكان حمل لفظ أولى الأمر عليهم أولى

'নিশ্চয় আমীর ও শাসকদের আমল আলেমদের ফাতওয়ার ওপর নির্ভর করে। প্রকৃতপক্ষে আলেমগণ হলেন, আমীরদের আমীর, শাসকদের শাসক। সুতরাং উলুল আমর শব্দটি দ্বারা দ্বীনের বিষয়ে অভিজ্ঞ আলেম উদ্দেশ্য নেওয়া শ্রেয়।'

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) লিখেছেন–

وأولوا الأمر هم العلماء والأمراء ، فإذا أمروا بما أمر الله به ورسوله وجبت طاعتهم

'উপরোক্ত আয়াতে উলুল আমর হলো, আলেমগণ এবং আমীরগণ। যখন তাঁরা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের (সা.)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী কোনো আদেশ দেবেন, তখন তাঁদের অনুসরণ ওয়াজিব।

[আল-জওয়াবুস সহীহ, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.), খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৩৮]

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (রহ.) আমীর ও শাসকদের অনুসরণের বিষয়ে লিখেছেন,

والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذ أمروا بمقتضى العلم فطاعتهم تبع لطاعة العلماء فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء

'চূড়ান্ত কথা হলো, আমীর ও শাসকদের অনুসরণ তখনই বৈধ হবে, যখন তাঁরা শরীয়তের ইলম অনুযায়ী ফয়সালা দেবেন। সুতরাং তাঁদের অনুসরণের বিষয়টি আলেমদের অনুসরণের অনুগামী ও নির্ভরশীল। কেননা অনুসরণ কেবলমাত্র বৈধ ও শরীয়তের ইলম নির্ধারিত সীমার মধ্যে হতে পারে। সুতরাং আলেমদের অনুসরণ যেমন রাসূলের অনুসরণের অনুগামী, তেমনি আমীরদের অনুসরণ আলেমদের অনুসরণের অনুগামী।'

[ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন, পৃষ্ঠা-১০]

অতএব উলুল আমর শব্দটি দ্বারা শাসক বা উলামা যেটিই উদ্দেশ্য নেওয়া হোক, শরীয়তের বিষয়ে তাঁদের ঐকমত্য পোষণ তাঁদের স্বতন্ত্র মতামত থেকে শক্তিশালী হবে। সুতরাং এখানে উলুল

আমর দ্বারা শরীয়তের বিষয়ে সুগভীর জ্ঞানের অধিকারীদের ইজমা উদ্দেশ্য হবে।

আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দিকে প্রত্যর্পণ :

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন,

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

'যদি তোমরা কোনো বিষয়ে মতপার্থক্যে লিপ্ত হও, তবে তা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দিকে প্রত্যর্পণ করো।'

আয়াতের এ অংশ প্রমাণ করে যে, কিয়াস শরীয়তের একটি অকাট্য হুজ্জত বা দলিল। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'তোমরা যদি মতানৈক্য করো' এর দুটি উদ্দেশ্য হতে পারে,

১. তোমরা যদি এমন বিষয়ে মতানৈক্য করো, যার সুস্পষ্ট বর্ণনা কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমাতে বিদ্যমান রয়েছে।

২. অথবা বিষয়টি এমন যে, যার সুস্পষ্ট বর্ণনা উপরোক্ত তিন উৎসের কোনোটিতে নেই।

প্রথম অর্থটি উদ্দেশ্য নেওয়া সঠিক হবে না, কেননা কোনো বিষয়ের যদি কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মতের মাঝে সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহলে সেটিই অনুসরণ করতে হবে। এটি তখন 'তোমরা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং উলুল আমরের অনুসরণ করো'–এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হবে। এবং এ বিষয়ে মতানৈক্য করার কোনো প্রশ্নই উঠবে না। যেমন, সালাত, হজ, যাকাত ইত্যাদি ফরয হওয়ার ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত নেই। সুতরাং প্রথম অর্থটি এখানে উদ্দেশ্য নেওয়া বিশুদ্ধ নয়।

আর দ্বিতীয় অর্থটি হলো, তোমরা যদি এমন বিষয়ে মতানৈক্য করো, যার সুস্পষ্ট বর্ণনা কোরআন, সুন্নাহ এবং ইজমাতে পাওয়া না যায়, তার বিধান হলো, মতানৈক্য পূর্ণ বিষয়ের সমাধান আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের নিকট সমর্পণ করা।

মতানৈক্যপূর্ণ বিষয় আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দিকে সমর্পণ করো, এর অর্থ অনেকে মনে করে যে 'তোমরা কোরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসরণ করো।' যেমনটি ডা. জাকির বা অপরাপর আহলে হাদীসগণ মনে করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থ তা নয়। কেননা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, কোনো বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা যদি কোরআন ও সুন্নাহে পাওয়া যায় তাহলে প্রথমত সেটাই মানা ফরয এবং কেউ তাতে দ্বিমত পোষণ করবে না। কিন্তু বিষয়টি যদি এমন হয় যে, যার সুস্পষ্ট বর্ণনা কোরআন ও সুন্নাহে নেই, কিংবা বাহ্যিক দৃষ্টিতে দুটি বিধান পরস্পর সংঘর্ষপূর্ণ হয়, তবে এ ক্ষেত্রে মতানৈক্য হওয়াটা স্বাভাবিক।

আর এ মতানৈক্য কোনো নিন্দনীয় বিষয় নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হে মুমিনগণ! তোমরা যদি মতানৈক্য করো, অর্থাৎ এ মতানৈক্য যদি অবৈধ বা হারাম হতো (যেমনটি ডা. জাকির নায়েক মনে করে থাকেন) তাহলে সরাসরি মতানৈক্য করতেই নিষেধ করা হতো। কিন্তু আয়াতের বাচনভঙ্গি এটাই প্রমাণ করে যে, যে সমস্ত বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা (নস) নেই, সে বিষয়ে তোমাদের মতানৈক্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এখন যদি তোমরা কখনও মতানৈক্যে লিপ্ত হয়ে পড়ো তাহলে,

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

'বিষয়টিকে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দিকে সমর্পণ করো।'

আয়াতের এ অংশের তাফসীর নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

তাফসীরে বাগাবীতে ইমাম বাগাবী (রহ.) লিখেছেন,

(فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُول) أى :إلى كتاب اللّٰه وإلى رسوله ما دام حيا وبعد وفاته إلى سُنته، والرُّد إلى الكتاب والسنة واجبٌ إن وُجد فيهما، فإن لم يُوجد فسبيله الاجتهاد.

'...আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দিকে প্রত্যর্পণ করো' অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব (কোরআন) এবং তাঁর রাসূলের কাছে বিষয়টি অর্পণ করো, যত দিন তিনি জীবিত থাকবেন। আর রাসূলের অবর্তমানে তাঁর সুন্নাহে বিষয়টির সমাধান অন্বেষণ করো। বিষয়টি যদি কোরআন ও সুন্নাহে বিদ্যমান থাকে, তাহলে কোরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করা অপরিহার্য। আর যদি কোরআন ও সুন্নাহে বিষয়টির সমাধান না পাওয়া যায়, তাহলে এর সমাধানের পথ হলো, ইজতেহাদ।'

তাফসীরে বায়যাবীতে ইমাম বায়যাবী (রহ.) লিখেছেন,

فردوه (فراجعوا فيه) إلى الله (إلى كتابه) والرسول (بالسؤال عنه فى زمانه والمراجعة إلى سنته بعده واستدل به منكرو القياس وقالوا إنه تعالى أوجب رد المختلف إلى الكتاب والسنة دون القياس وأجيب بأن رد المختلف إلى المنصوص عليه إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه وهو القياس ويؤيد ذلك الأمر به بعد الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله فإنه يدل على أن الأحكام ثلاثة مثبت بالكتاب ومثبت بالسنة ومثبت بالرد إليهما على وجه القياس

'বিষয়টি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের কাছে সমর্পণ করো। এর অর্থ হলো, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের দিকে বিষয়টি সমর্পণ করো, যত দিন তিনি জীবিত ছিলেন; বিবদমান বিষয়ে তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করো এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর সুন্নাতের মাঝে এর সমাধান অনুসন্ধান করো।

এ আয়াতের দ্বারা কিয়াস অস্বীকারকারীরা প্রমাণ পেশ করে থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা মুখতালাফ বা মতানৈক্য পূর্ণ বিষয়কে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দিকে সমর্পণের নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং এখানে

কিয়াসের কোনো সুযোগ থাকে না। এর উত্তর হলো, বিবাদপূর্ণ বিষয়টি কোরআন ও হাদীসের দিকে প্রত্যর্পণের পদ্ধতি হলো, তামসীল ও বেনা তথা সাদৃশ্যপূর্ণ দুটি বিষয়ের একটিকে অপরটির সাথে তুলনা করা, যার অপর নাম হলো কিয়াস। আর এখানে যে কিয়াস উদ্দেশ্য, তার শক্তিশালী প্রমাণ পাওয়া যায়, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের অনুসরণের নির্দেশ দেওয়ার পর আবার বিবাদপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করার দ্বারা। কেননা এ নির্দেশ প্রমাণ করে যে, শরীয়তের বিধিবিধান তিন প্রকার। যথা–

১. কোরআন দ্বারা প্রমাণিত (মুসবাত বিল কিতাব)

২. সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত (মুসবাত বিস সুন্নাহ)

৩. কোরআন ও সুন্নাহ থেকে কিয়াসের মাধ্যমে উৎসারিত বিধান।

[তাফসীরে বায়যাবী, পৃষ্ঠা-২০৬]

আল্লামা ফখরুদ্দিন রাযী (রহ.) লিখেছেন,

أن المراد :فان تنازعتم فى شيء حكمه غير مذكور فى الكتاب والسنة والاجماع ، واذا كان كذلك لم يكن المراد من قوله :(فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ) طلب حكمه من نصوص الكتاب والسنة .فوجب أن يكون المراد رد حكمه إلى الأحكام المنصوصة فى الوقائع المشابهة له ، وذلك هو القياس ، فثبت أن الآية دالة على الأمر بالقياس.

‘(আয়াতের এ অংশের উদ্দেশ্য হবে)... যদি তোমরা এমন বিষয়ে মতানৈক্য করো, যার বর্ণনা কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমাতে বিদ্যমান নেই। সুতরাং ‘আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের কাছে সমর্পণ করো’–এ আদেশ দ্বারা কোরআন ও সুন্নাহের সুস্পষ্ট বিধান উদ্দেশ্য হবে না। বরং উদ্দেশ্য হবে, ‘তোমরা মতানৈক্য পূর্ণ বিষয়টিকে কোরআন ও সুন্নাহের সাথে তুলনা করো। আর একেই কিয়াস বলে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, আয়াতটি কিয়াসের ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেছে।’

(তাফসীরে রাযী, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-১০৭)

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ‘আহকামুল কুরআনে’ উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন,

ومن تنازع ممن بعد عن رسول الله رد الأمر إلى قضاء الله ثم إلى قضاء رسول الله فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء نصا فيهما ولا فى واحد منهما ردوه قياسا على أحدهما

‘রাসূল (সা.)-এর অবর্তমানে কেউ যদি কোনো বিষয়ে মতানৈক্যে লিপ্ত হয়, তবে বিষয়টিকে সে আল্লাহর ফয়সালার দিকে সোপর্দ করবে। অতঃপর তাঁর রাসূলের (সা.) ফয়সালা গ্রহণ করবে। মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ের সমাধান যদি কোরআন ও সুন্নাহের কোনোটিতে না থাকে, তাহলে কোরআন ও সুন্নাহের আলোকে কিয়াস করে সমাধান করবে।’ সুতরাং ডা. জাকির নায়েকের জন্য এ আয়াতের ব্যাখ্যায় শুধু কোরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসরণের বিষয়টি প্রমাণ করা এবং আয়াতের পরবর্তী অংশ উল্লেখ না করা বাস্তবতার পরিপন্থী।

ইসলামে আলেম ও ফকীহদের অনুসরণের গুরুত্বের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) তাঁর বিখ্যাত কিতাব ‘ই’লামুল মুয়াক্কিয়ীন আন রাব্বিল আলামীন’-এ আলাদা একটা পরিচ্ছেদ তৈরি করেছেন। পরিচ্ছেদের শিরোনাম হলো, المنزلة العظمى لفقهاء الإسلام (ইসলামের ফকীহদের গৌরবময় অবস্থান)। তিনি লিখেছেন,

فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام فهم فى الأرض بمنزلة النجوم فى السماء بهم يهتدى الحيران فى الظلماء وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)

‘ইসলামের ফকীহগণ এবং যাদের ফাতওয়াসমূহ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ও পরিচিত; যারা শরীয়তের বিধিবিধান ইস্তেম্বাতের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। যারা হালাল-হারাম নির্ণয়ের নীতিমালা নির্ধারণ করেছেন। ভূপৃষ্ঠে তাঁদের অবস্থান আসমানের তারকার ন্যায়; অন্ধকারে পথহারা ব্যক্তি তাঁর দ্বারা সঠিক পথের দিশা পায়। তাদের প্রতি মানুষের প্রয়োজন মানুষের খাদ্য ও পানীয়র প্রতি যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তার চেয়ে বেশি। বাপ-দাদা ও মায়েদের অনুসরণের চেয়ে তাঁদের অনুসরণ অধিক আবশ্যকতার দাবি রাখে।

কেননা আল্লাহ তা’আলা বলেছেন,

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে মান্য করো, আর মান্য করো আল্লাহর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যাঁরা উলুল আমর রয়েছেন তাঁদের। যদি তোমরা কোনো বিষয়ে মতানৈক্যে লিপ্ত হও, তাহলে বিষয়টিকে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দিকে প্রত্যর্পণ করো; যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে থাকো।

[ই’লামুল মুয়াক্কিয়ীন, পৃষ্ঠা-৯]

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : সুন্নাত

মাও. তৈয়ব হুসাইন
মুরাদনগর, কুমিল্লা।

জিজ্ঞাসা:

ঘরে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় প্রথমে কোন পা রাখা উত্তম। ডান পা, নাকি বাঁ পা। এ ক্ষেত্রে মসজিদ আর ঘরের মধ্যে কোনো ব্যবধান আছে কি না?

সমাধান :

ঘরে প্রবেশের সময় প্রথমে ডান পা দেওয়া এবং বাহির হওয়ার সময় প্রথমে বাঁ পা দেওয়া সুন্নাত। কেননা তুলনামূলক ঘর বাহির থেকে উত্তম আর প্রত্যেক উত্তম কাজ ও উত্তম স্থানে ডানকে প্রাধান্য দেওয়া সুন্নাত। ঘর থেকে মসজিদ অনেক উত্তম জায়গা এতে কোনো সন্দেহ নেই। (বুখারী ১/২৯)

প্রসঙ্গ : কবুতর পালন

মুহা: ইসমাঈল
দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

জিজ্ঞাসা:

কবুতর পোষণের শরয়ী বিধান কী? অনেক সময় কবুতর অন্যের ক্ষেত খায় যেমন– ধান, গম ইত্যাদি এবং কার ক্ষেত খেয়েছে তা জানা যায় না। এমতাবস্থায় করণীয় কী? একজনের কবুতর অন্যের বাড়িতে গিয়ে বাসা বাঁধে এবং বাচ্চা দেয় উক্ত কবুতর ও বাচ্চার হুকুম কী?

সমাধান :

শরীয়তের দৃষ্টিতে কবুতর পোষণের মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। তবে সেগুলোকে যথাযথ দানাপানি খাওয়ানোর প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। তার পরও যদি কারো ক্ষেতের ধান, গম ইত্যাদি খেয়ে ফেলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আর একজনের কবুতর অন্যের বাড়িতে বাচ্চা ফোটালে কবুতর ও বাচ্চার মালিক তালাশ করবে মালিক খুঁজে না পেলে গরিবকে সদকা করে দেবে। (আদ্দুরুল মুখতার ২/৩০৪)

প্রসঙ্গ : যৌতুক

মাও. ইমদাদুল্লাহ
টেকনাফ, কক্সবাজার।

জিজ্ঞাসা:

আমাদের দেশে যৌতুক দেওয়া ও নেওয়া হারাম বলে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে, এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধিবিধান কী?

সমাধান :

বিবাহে মোহর ব্যতীত বর-কনের একপক্ষ থেকে অন্যপক্ষ কোনো জিনিস দাবি করে নেওয়াকে যৌতুক বলা হয়। এটা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত বিধায় তার আদান-প্রদান হারাম। অবশ্য বিবাহের পরে বর-কনেপক্ষের পরস্পর আদান-প্রদান সন্তুষ্টচিত্তে আগ্রহের সাথে কোনোরূপ দাবি ছাড়া হলে এতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ রাসূল (সা.) পরস্পর হাদিয়া দেওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। (মিশকাত ২/২৫৫, আল বাহরুর রায়িক ৩/১৮৭)

প্রসঙ্গ : পালক পুত্র

মুহা : বদরুদ্দোজা বদর
সিংড়া, নাটোর।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের এলাকায় এক ব্যক্তি একটি ছেলেকে ছোটবেলা থেকেই লালন-পালন করে এবং তাকে ছেলে বলে আখ্যা দেয়। ছোটবেলায় তার স্ত্রী তাকে দুধও পান করায়। বর্তমানে সে বড় হয়েছে তার জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করা প্রয়োজন। তার ইচ্ছা, জাতীয় পরিচয়পত্রে ছেলের আসল পিতার নাম না দিয়ে তার নিজের নাম দেওয়া। অন্যথায় ছেলেটি জানতে পেরে তার কাছ থেকে চলে যাওয়ার ভয় রয়েছে। এমনটি করা বৈধ হবে কি না?

সমাধান :

ইসলামী শরীয়তে অন্যের ছেলেকে নিজের ছেলে বলে দাবি করা এবং অপর লোককে নিজের পিতা বলে প্রকাশ করা হারাম বিধায় পালক ছেলের জাতীয় পরিচয়পত্রে তার জন্মদাতা পিতার নামের স্থানে তাকে লালন-পালনকারীর নাম ব্যবহার করা যাবে না। (মিশকাত পৃ. ১৮৭, আদ্দুররুল মুখতার ১/২৫৩)

প্রসঙ্গ : ঝাটকা সংরক্ষণ আইন

মুহা: ছুফিউল্লাহ
দৌলতখান, ভোলা।

জিজ্ঞাসা:

(১) সরকারের পক্ষ থেকে মেঘনা

নদীতে অভিযান (ছোট আকারের ইলিশ তথা ঝাটকা ধরা নিষেধ) চালানো হয়। এবং নৌবাহিনী দ্বারা পাহারা দেওয়া হয় তার পরও জেলেরা মাঝেমধ্যে নদীতে মাছ ধরে। এখন জানার বিষয় হলো, জেলেদের জন্য সরকারি আইন ভঙ্গ করে মাছ ধরা বৈধ হবে কি না?

সমাধান-১

সরকারের আইন যদি গোনাহমুক্ত ও জনস্বার্থে হয় জনগণের জন্য তা মেনে চলা জরুরি। প্রশ্নেবর্ণিত ঝাটকা সংরক্ষণ আইন যেহেতু জনস্বার্থে করা হয়েছে এবং তাতে গোনাহের কোনো কারণও নেই। তাই জেলেদের জন্য তা মানা জরুরি। উক্ত আইন অমান্য করে মাছ ধরা তাদের জন্য বৈধ হবে না। (সূরা নিসা-৫৯)

জিজ্ঞাসা-২

অনেক সময় নৌবাহিনীরা অভিযান চালিয়ে জেলেদের থেকে জাল, মাছ, নৌকা ইত্যাদি নিয়ে যায় এবং জালগুলো পুড়ে ফেলে বা টাকা নিয়ে দিয়ে দেয়। কিন্তু মাছগুলো কিছু নিজেরা রাখে বাকিগুলো বিভিন্ন মাদরাসায় দিয়ে দেয়। আমার জানার বিষয় হলো, মাদরাসা কর্তৃক ওই মাছ নেওয়া বা ছাত্রদের জন্য খাওয়া বৈধ হবে কি না?

সমাধান-২

নৌবাহিনীর জন্য এ ধরনের অপরাধের কারণে জেলেদেরকে আইনের আওতায় আনার অধিকার আছে। তা না করে তাদের জাল, মাছ, নৌকা ইত্যাদি নিয়ে যাওয়া জুলুমের নামান্তর। কারণ শরীয়তে আর্থিক জরিমানার অবকাশ নেই। আর যেহেতু মাছগুলো অবৈধ পন্থায় জোরপূর্বক জেলেদের থেকে হস্তগত করা হয়েছে তাই সেগুলো নৌবাহিনী ও মাদরাসা কর্তৃপক্ষের জন্য জেনেশুনে গ্রহণ করা ও ছাত্রদেরকে তা খাওয়ানো জায়েয হবে না। (সূরা নিসা-২৯)

প্রসঙ্গ : ছবি

মুফতী ছফিউল্লাহ
দৌলতখান, ভোলা।

জিজ্ঞাসা :

মৃত ব্যক্তির ছবি দেখা বা ব্যানারে যে সমস্ত ছবি টানানো হয়, এগুলো দেখা জায়েয হবে কি না?

সমাধান :

শরীয়তের দৃষ্টিতে বিনা প্রয়োজনে ছবি তোলা এবং ইচ্ছাকৃত দেখা ও সংরক্ষণ করা সবই গোনাহ। (মুসলিম ২/২০১, আহসানুল ফাতাওয়া ৮/১৮৯)

প্রসঙ্গ : মোবাইল ফোন

মুফতী ছফিউল্লাহ
দৌলতখান, ভোলা।

আমাদের মাদরাসার আইন হলো, ছাত্রদের জন্য মোবাইল ফোন ব্যবহার করা নিষেধ। এখন যদি কোনো ছাত্র মোবাইল ব্যবহার করে এবং কর্তৃপক্ষ তার থেকে মোবাইল নিয়ে মাদরাসার মতবাখ ফান্ডে জমা দেয় তাহলে এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে কি না? বিভিন্ন মাদরাসায় ছাত্রদেরকে মোবাইলের কারণে বহিষ্কার করা হয়, ফলে অনেক ছাত্র ইলমে দ্বীন থেকে চিরতরে মাহরুম হয়ে যায়। এমনকি দাড়ি শেভ করে এবং শার্ট-প্যান্ট পরে ইত্যাদি। আমার জানার বিষয় হলো, এমতাবস্থায় ছাত্রদেরকে মোবাইলের কারণে বহিষ্কার করা ভালো হবে; নাকি তাকে মাদরাসায় রেখে মোবাইলের গোনাহ বোঝানো ভালো হবে?

সমাধান :

মাদরাসা কর্তৃক ঘোষিত আইনকানুন অনুযায়ী ছাত্রদের মোবাইল ধরা পড়লে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তা মতবাখ ফান্ডে জমা করতে আপত্তি নেই। প্রথমে নসীহত করা উচিত। তার পরও যদি মোবাইল ব্যবহার থেকে বিরত না থাকে, তাহলে মাদরাসার ইলমী ও আমলী পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে এ ধরনের ছাত্রকে মাদরাসা থেকে বহিষ্কার করাই যথার্থ হবে। গুটিকয়েক ছাত্রের উপকারের আশায় সকল ছাত্রের ক্ষতি ডেকে আনা ঠিক হবে না। (সূরা মায়েদা, বুখারী ১/৩৮২)

প্রসঙ্গ : পর্দা

হাফেজ রোস্তম আলী
রাজারহাট, কুড়িগ্রাম।

জিজ্ঞাসা :

বর্তমানে যাতায়াতের বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে। যেমন- বাস, রিকশা, মোটরসাইকেল ইত্যাদি। বাসের মধ্যে নিজের পরিবার নিয়ে যাতায়াত করতে পর্দার অসুবিধা দেখা দেয়। আবার রিকশায় যাতায়াত অনেক দূরত্বের কারণে অসম্ভব। এমতাবস্থায় একজন আলেমের জন্য নিজ পরিবারকে দিনে বা রাত্রে মোটরসাইকেলে করে যাতায়াত করা জায়েয হবে কিনা? কেউ কেউ বলেন, আলেমের জন্য এরূপ কাজ উচিত নয়। তাঁদের কথা কতটুকু সত্য?

সমাধান :

মহিলাদের জন্য শরীয়তে পর্দার যে বিধান দেওয়া হয়েছে তার স্বরূপ হচ্ছে, পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে নারীর দেহের আকৃতি-গঠনকে আড়ালে রাখা। যা ঘরে

থাকাকালীন চার দেয়াল বা পর্দা ঝুলিয়ে পালন সম্ভব। আর প্রয়োজনে বাইরে যেতে হলে হাওদজ বা পালকির মাধ্যমে পর্দা রক্ষার বাস্তব উপমা নবীপত্নী ও সাহাবাদের জীবনে বিদ্যমান। মোটরসাইকেলে বোরকা পরে ভ্রমণ বৈধ হলেও পর্দার উল্লিখিত প্রথম স্তর, যা শরীয়তে একান্ত কাম্য এর ওপর আমল সম্ভব হবে না। উপরন্তু একজন আলেমের জন্য এভাবে ভ্রমণ করা যথেষ্ট দৃষ্টিকটুও বটে। যে কাজ করলে মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা লোপ পায়, একজন আলেমের জন্য তা পরিহার করা আবশ্যক। (সূরা আহযাব ৫৩, সূরা আন নূর ৩১, সূরা আহযাব-৩৩)

প্রসঙ্গ : দাড়ি

মাও. নাজমুল হুদা ফিরোজী
তুলাতলী, ভোলা।

জিজ্ঞাসা :

আমরা জানি, দাড়ি রাখা ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিধান। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অন্যতম জীবন্ত এই সুন্নাতটি আজ অত্যন্ত অবহেলার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। সুন্নাত, মুস্তাহাব, ফরজ ও ওয়াজিবের স্তরগত পার্থক্যকে পুঁজি করে এই বিধানটিকে এড়িয়ে যাওয়ার মারাত্মক প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। অনেকে এটিকে সুন্নাত বলে, না রাখলেও তেমন অসুবিধা নেই বলে উড়িয়ে দিচ্ছে। এমতাবস্থায় জানার বিষয় হলো, প্রকৃত পক্ষে ইসলামী শরীয়তে দাড়ির গুরুত্ব কতটুকু। এটি কি সুন্নাত না ওয়াজিব, সুন্নাত হলে কোন ধরনের সুন্নাত?

সমাধান :

শরীয়তের দৃষ্টিতে কমপক্ষে এক মুষ্টি পরিমাণ দাঁড়ি রাখা ওয়াজিব। এর কমে কাটা বা মুণ্ডন করা কবীরা গোনাহ। (বুখারী ২/৮৭৫, রদ্দুল মুহতার ৬/৪০৭)

প্রসঙ্গঃ নামায

মাও. মাহমুদুল হাসান
বারিধারা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

(ক) কোনো ব্যক্তি বিমানে কোথাও সফর করার ইচ্ছা করে এমতাবস্থায় তার আসরের নামায কাযা হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে তাহলে সে কি যোহরের নামাযের ওয়াক্তে আসরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগেই আসরের নামায পড়তে পারবে?

(খ) এমনিভাবে ঢাকা সিটির অধিবাসী বিমানে সফরকালে কখন সফর শুরু করবে? বিমান ছাড়ার পর, নাকি ইমিগ্রেশনে প্রবেশের পরপরই?

সমাধান :

(ক) যেকোনো ফরয নামাযের শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে উক্ত নামায পড়লে তা সহীহ হবে না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি আসরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগে যোহরের ওয়াক্তে আসরের নামায পড়লে তা আদায় হবে না। বরং বিমানে যখন আসরের ওয়াক্ত হবে, তখনই পড়তে হবে।

(খ) ঢাকায় বসবাসরত ব্যক্তি ঢাকা থেকে বিমানে সফরকালে ঢাকা শহরের আকাশসীমা অতিক্রম করার পর কসর শুরু করবে এর পূর্বে নয়। তাই বিমানবন্দরে থাকা অবস্থায় নামায পুরা পড়বে। কসর পড়বে না। (সূরা নিসা ১০৩, মুসলিম ১/৪১৭)

প্রসঙ্গ : বন্ধক

মাও. আব্দুস সালাম
কাহালু, বগুড়া।

আমার নিকট এক বিঘা জমি আছে। এখন আমার ৫০ হাজার টাকার প্রয়োজন। এমতাবস্থায় জমি অন্যের নিকট বন্ধক রেখে ৫০ হাজার টাকা নেওয়া জায়েয হবে কিনা? না হলে কারণ কী? জায়েযের কোনো পদ্ধতি আছে কি না? যেমন বন্ধকগ্রহীতা যদি বন্ধকদাতা থেকে বছরে ২ বা ৩ হাজার টাকা কর্তন করে তাহলে এই পদ্ধতি জায়েয হবে কি না? অথচ এক বিঘা জমি অন্যের কাছে ভাড়া দিলে বছরে ১০ হাজার টাকা পাওয়া যেত।

সমাধান :

জমি বন্ধক রেখে টাকা নেওয়া জায়েয। তবে শর্ত হলো, ঋণদাতা উক্ত জমি হতে কোনো প্রকার উপকৃত হতে পারবে না। যেহেতু ঋণদাতা বন্ধকি জমি হতে উপকৃত হয় বিধায় প্রশ্নেবর্ণিত পদ্ধতিতে জমি বন্ধক রাখা নাজায়েয এবং বন্ধকি জমিন হতে উপকৃত হওয়ার যে হিলা করেছেন, তাও নাজায়েয। তবে জায়েয পদ্ধতি হলো, জমি নির্দিষ্ট মেয়াদে ইজারার (ভাড়া) চুক্তিতে দেবে এবং যে পরিমাণ টাকা লাগবে অগ্রিম ভাড়া হিসেবে উসুল করে নেবে। অথবা بيع بالوفاء এর পদ্ধতি গ্রহণ করবে যার সঠিক নিয়ম হলো, বিক্রি করার পর ক্রেতা থেকে এ মর্মে ওয়াদা নেবে যে আমি যখন উক্ত টাকা ফেরত দেব, তখন আপনি আমার জমি আমার নিকট ফেরত দেবেন। তবে বিক্রির সময় এই ওয়াদা নেওয়া যাবে না। (আদ্দুররুল মুখতার ২/২৬৬, রদ্দুল মুহতার ৫/২৭৬)

প্রসঙ্গঃ মসজিদ

মুহাঃ জোবাইর হোসাইন
বসুন্ধরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

(১) আমাদের মসজিদটি নতুনভাবে বিল্ডিং করতে চাচ্ছি ইনশাআল্লাহ! মসজিদটির পাশে সরকারি লোকাল রাস্তা রয়েছে। রাস্তাটির প্রস্থ বড় থাকায় তিন ফুট জায়গায় মসজিদের জমির সাথে যোগ করে বিল্ডিং করতেছি। এ ক্ষেত্রে রাস্তার দৈর্ঘ্য ৫২ ফুট এবং প্রস্থ ৩ ফুট জায়গা মসজিদের জমির সাথে যুক্ত করে মসজিদ নির্মাণ করলে নামায আদায় শরীয়তসম্মত হবে কি?

(২) মসজিদের বারান্দার উত্তর ও দক্ষিণ পাশে এবং মেহরাবের উত্তর ও দক্ষিণ পাশে টয়লেট ওজুখানা করা যাবে কি? যদি করা যায় তাহলে কিভাবে করতে হবে?

সমাধান :

(১) উল্লিখিত পরিমাণ জায়গা রাস্তা থেকে নেওয়ার কারণে যদি চলাচলে জনসাধারণের কোনো সমস্যা না হয়, তাহলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে নেওয়া জায়েয আছে এবং এতে নামায আদায়ও শুদ্ধ হবে।

(২) নতুন নির্মিত বারান্দার উত্তর ও দক্ষিণ পাশে এবং মেহরাবের উত্তর ও দক্ষিণ পাশের জায়গায় অতীতে কখনো মসজিদ হিসেবে নামায পড়া না হয়ে থাকলে টয়লেট এবং ওজুখানা নির্মাণ করা যাবে। তবে টয়লেটের দুর্গন্ধ যাতে কোনোভাবেই মসজিদে না আসে এদিকে লক্ষ রাখতে হবে। (ফাতাওয়া আলমগীর ২/৪৫৬, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ১৮/১৬৭)

প্রসঙ্গ : নামাযের কাতার

মাও. শফিক কাসেমী
ব্রাহ্মন্দী, নরসিংদী।

জিজ্ঞাসা :

মসজিদের অভ্যন্তরে মুসল্লী অনুপাতে স্থান সংকুলান না হওয়ায় ইমাম সাহেব সামনে না দাঁড়িয়ে মুসল্লীদের প্রথম কাতারের থেকে সামান্য আগে বেড়ে দাঁড়ান। ইমাম সাহেব নিজের ডান ও বাম পার্শ্বে প্রায় একহাত বা তার কিছু কম পরিমাণ ফাঁকা রেখে মুসল্লীদের দাঁড় করান। কারণ ডান বা বামের মুসল্লীরা ইমাম সাহেবের লাগোয়া পার্শ্বে দাঁড়ালে রুকু-সিজদার সময় মুসল্লীদের হাত-পা ইমাম সাহেবের শরীরে লাগার কারণে তাঁর নামাযে বিঘ্নতা সৃষ্টি হয়। জানার বিষয় হলো, ইমাম সাহেবের কাতারের মাঝে দাঁড়ানো অবস্থায় উভয় পার্শ্বে এ পরিমাণ ফাঁকা রেখে কাতার করানোতে নামাযে কোনো সমস্যা হবে কি না?

সমাধান :

দুইয়ের অধিক মুক্তাদী হলে ইমাম সাহেব এক কাতার আগে দাঁড়ানো জরুরি। তবে মুসল্লীদের কোনোভাবে সংকুলান না হলে অতি প্রয়োজনে কাতারের মাঝখানে দাঁড়ানোর অবকাশ আছে। এমতাবস্থায় ইমামের পায়ের গোড়ালি মুক্তাদীর পায়ের গোড়ালি থেকে আগে থাকতে হবে। এবং ইমামের উভয় পার্শ্বে কাতারে ফাঁকা না রেখে মুসল্লীরা দাঁড়াবে বিশেষ কোনো অসুবিধা না হলে এর ব্যতিক্রম করা অনুচিত। (আদ্দুররুল মুখতার ১/৮৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৮৯)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

আলহাজ জয়নাল আবেদীন
সাভার, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

চল্লিশ বছর ধরে এক জায়গায় মসজিদ হিসেবে নামায পড়ে আসা হচ্ছে। এখন মসজিদ কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে নিচতলা মসজিদের উন্নতিকল্পে মার্কেট বানাবে। আর ওপরতলা মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করবে। এখন জানার বিষয় হলো, এটা কতটুকু শরীয়তসম্মত?

সমাধান :

শরীয়তের বিধান মতে মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত স্থানে একবার মসজিদের কার্যক্রম তথা নামায ইত্যাদি আরম্ভ হয়ে গেলে তা শরয়ী মসজিদ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে কিয়ামত পর্যন্ত পাতাল থেকে আসমান পর্যন্ত মসজিদ হিসেবেই গণ্য হয়ে যায়। পরবর্তীতে তার ওপরে-নিচে মসজিদের কার্যক্রম ছাড়া অন্য কিছু করার অবকাশ থাকে না। প্রশ্নোল্লিখিত জায়গা মসজিদের কাজে ওয়াকফকৃত হলে চল্লিশ বছর ধরে মসজিদ হিসেবে নামায পড়ে আসার পর সেখানে মার্কেট নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য নয়। বিধায় বর্তমানে উক্ত জায়গার নিচতলায় মার্কেট করা জায়েয হবে না। যদিও তা মসজিদের উন্নতিকল্পে হোক না কেন। (আদ্দুররুল মুখতার ১/৩৭৯)

প্রসঙ্গ : ঈসালে সাওয়াব

মুহাঃ আরিফুল ইসলাম
চাটমোহর, পাবনা।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের গ্রামে একটি নিয়ম প্রচলিত আছে সেটা হলো, যদি কোনো ব্যক্তি

মারা যায়, তাহলে কিছুদিন পরে এলাকার কোনো হাফিজিয়া মাদরাসার ছাত্র বাড়িতে নিয়ে এসে মৃত ব্যক্তির জন্য ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কোরআন খতম করানো হয়। অতঃপর তাদের খাবারের ব্যবস্থা করা হয় এবং তাদেরকে কিছু টাকা হাদিয়া দিয়ে বিদায় দেওয়া হয়। জানার বিষয় হলো, ঈসালে সাওয়াবের কোনো বিনিময় নেওয়া জায়েয আছে কি না?

সমাধান :

মৃত ব্যক্তির ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কোরআন খতম করে বা কোরআন পড়িয়ে কোনো প্রকারের বিনিময় গ্রহণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। চাই তা খানাপিনা হোক বা নগদ টাকা হোক একই হুকুম। বিনিময় গ্রহণ করে কোরআন পড়ার দ্বারা তিলাওয়াতকারী ও মৃত ব্যক্তি উভয়ে সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত বিনিময় দিয়ে ঈসালে সাওয়াবের পদ্ধতি শরীয়তসম্মত নয়। (সূরা বাকারা-৪১, রদ্দুল মুহতার ১/৫৭)

প্রসঙ্গ : বর্গা, সুদ

মুহা : মনিরুল ইসলাম
বসুন্ধরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা-১

যদি কেউ একটি ছাগল ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা দিয়ে ক্রয় করে এবং অপর এক ব্যক্তির নিকট বর্গা পালতে দেয়। অতঃপর ৬-৭ মাস পরে ছাগলটি ১০০০০ (দশ হাজার) টাকা বিক্রি করে এবং মালিকে মূলধন ৫০০০ টাকা বাদ দিয়ে লভ্যাংশ অপর ৫০০০ টাকা দুই ভাগে মালিক ও বর্গাইন ভাগ করে নেয় তবে জায়েয হবে কি না?

সমাধান-১

ছাগল লালন-পালনের প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিটি শরীয়তসম্মত নয়। (আদ্দুররুল মুখতার ২/১৭৭, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/৩০৮)

জিজ্ঞাসা-২

প্রতি মাসে ব্যাংকে ৫০০ টাকা করে জমা করে ১৫ বছরে মোট টাকা হয় ৯০০০০ টাকা কিন্তু ব্যাংক যদি তাকে মূলধন ৯০০০০ টাকাসহ সর্বমোট ১,৩০০০০ টাকা দেয় তবে সেই টাকা জায়েয হবে কি না?

সমাধান-২

মূল সঞ্চয়ের সাথে সুদ হিসেবে প্রদেয় অতিরিক্ত ৪০ হাজার টাকা গ্রহণ করা বৈধ হবে না। (সূরা আলে ইমরান-১৩, মুসলিম ২/২৭)

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও
সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

বি.দ্র. মসজিদ-মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে।

মলফূজাতে আকাবের

আবু নাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন

অল্প আয় কখন যথেষ্ট হয়?

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, মানুষ অল্পে তুষ্টি, মিতব্যয়ী ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে চললে অল্প আয়েও চলতে পারে। আর এ ধরনের তাকওয়ার অধিকারী ব্যক্তিই তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে। কামালাতে আশরফিয়্যাহ মলফূজ নং ৬৩০

মাদ্রাসার পদোন্নতি :

হযরত মাও. মুফতী আযীযুল হক (রহ.) বলেন, যদি মাদ্রাসার ব্যবস্থাপকগণ নিষ্ঠাবান হন এবং শিক্ষকগণ দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন হন, তখন তাঁদের ইখলাস ও যোগ্যতার কারণে পাহাড়ের চূড়ায়ও ছাত্রের সমাগম হবে। মাদ্রাসা কোনো কেন্দ্রীয় জায়গায় না হলেও তার পদোন্নতি হবে (তাযকিরায়ে আযীয ২১৩)

সৎকাজে সাহস সৃষ্টির ব্যবস্থাপত্র :

মাওলানা কারী আমীর হুসাইন (রহ.) বলেন, নেক কাজের চিকিৎসা হলো 'সাহস' আর সাহস সৃষ্টি হয় সালেহীন তথা নেক লোকদের সংশ্রবে। যদি নেক লোকদের সংশ্রবের সুযোগ না হয় তাহলে তাঁদের জীবনী এবং লিখিত পুস্তকসমূহ অধ্যয়ন করবে। এতে ইনশা'আল্লাহ সাহস সৃষ্টি হবে। এর মাধ্যমে নেক কাজ সহজ হয়ে যাবে। (কালিমাতে সিদ্‌ক ও আদল)

পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর :

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সৈয়্যদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর নিকট তাঁর এক মুরীদ পত্রযোগে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। প্রশ্ন ও উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হলো :

প্রশ্ন : আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জনের বিশেষ আমল কী?

উত্তর : আল্লাহর যিকির, হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ পাক বলেন, انا جليس من ذكرنى যে আমার যিকির করে, আমি তার সঙ্গী।

প্রশ্ন : কিভাবে দো'আ করলে তা কবুল হয়? দো'আ করার পদ্ধতি কী?

উত্তর : কান্নাকাটি এবং মনোযোগ সহকারে দো'আ করবে, হালাল খাবার ভক্ষণ করবে, চাওয়া বস্তু পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করবে না এবং আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নৈরাশ হবে না। (উল্লিখিত শর্তগুলো মেনে চলে দো'আ করলে তা অবশ্যই কবুল হবে)

প্রশ্ন : কী কাজ করলে রিযিক কমে যায়?

উত্তর : নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা।

প্রশ্ন : কী আমল করলে ধনসম্পদ বাড়ে?

উত্তর : আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং তাকওয়া।

প্রশ্ন : কী কাজ করলে মানুষ দুনিয়াতে লাঞ্ছিত হয়?

উত্তর : 'অহঙ্কার, অহমিকা' এবং দুর্বল লোকদেরকে কষ্ট দেওয়া। ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম, পৃ. ১৮৪/১৮৫

তা'আল্লুক মা'আল্লাহ :

হযরত মাওলানা মুফতী জামালুদ্দীন (রহ.) বলেন, মনে করুন, এক ব্যক্তির নিকট পাকা দালান আছে। সেখানে এসি লাগানো আছে এবং মূল্যবান বাল্ব লাগানো আছে। কিন্তু যদি এগুলো বিদ্যুতের সাথে সংযোগ দেওয়া না হয় তাহলে এসব শান্তির সরঞ্জাম নিষ্ফল। তেমনিভাবে আমরা মুফতী হয়েছি মুহাদ্দিস হয়েছি, মুফাসসিরে কোরআন হয়েছি। এসব হলো অন্তরের শান্তির উপকরণ। যদি এগুলোর সাথে তা'আল্লুক মা'আল্লাহ তথা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন না হয় তাহলে উল্লিখিত সবই নিষ্ফল ও বেকার বরং ক্ষতিকর। এ বিষয়ের প্রতিই কবি ইঙ্গিত করেছেন,

شیخ شدی وزاہد شدی ودانشمند
ایں جملہ شدی ولے مسلمان نشدی

অর্থাৎ, তুমি তো শায়খ হয়েছ যাহেদ (খোদাভীরু) হয়েছ জ্ঞানী হয়েছ, এসব কিছুই হয়েছ কিন্তু মুসলমান হতে পারোনি। তারপর বললেন, তাহাজ্জুদ আদায় এবং আল্লাহ ওয়ালাদের সংশ্রববিহীন তা'আল্লুক মা'আল্লাহ অসম্ভব। (বর্ণনায় লেখক)

আমলের মধ্যে ত্রুটির কারণ :

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, আমলের মধ্যে ত্রুটির কারণ দুটি। (এক). দুনিয়ার মহব্বত (দুই). আখিরাতের প্রতি গুরুত্বের অভাব। কামালাতে আশরফিয়্যাহ মলফূজ নং ৩৮৫

AL MARWAH OVERSEAS
recruting agent licence no-rl156

ROYAL AIR SERVICE SYSTEM
hajj, umrah, IATA approved travel agent

হজ, ওমরাসহ বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং ও সকল এয়ারলাইন্স টিকেটিং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে অল্পখরচে দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।

Shama Complex (6th Floor)
66/A Naya Paltan, V.I.P Road
(Opposite of Paltan Thana East Side of City Haeart Market)
Dhaka: 1000, Bangladesh.
Phone: 9361777, 9333654, 8350814
Fax 88-02-9338465
Cell: 01711-520547
E-mail: rass@dhaka.net

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সর্বপ্রকার বাতিলের মোকাবেলায় এগিয়ে যাবে
"আল-আবরার" এই কামনায়

জনপ্রিয় ১৯৩৭ সাবান

প্রস্তুতকারক

হাজী নুরআলী সওদাগর এন্ড সন্স লিঃ

চাক্তাই, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

ফোন : বিক্রয় কেন্দ্র : -০৩১-৬৩৪৯০৫, অফিস: ০৩১-৬৩২৪৯৩, ৬৩৪৭৮৩